ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি

সমরজিৎ কর

বিদ্যোদয়

লাইব্রেরী

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা .৯
অফিস : ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

স্বর্গত অরিজিৎ কর স্মরণে

—মেজদা

ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি মূলতঃ বিজ্ঞানাশ্রয়ী রচনা। কিছুটা অ্যাডভেঞ্চারও বটে। প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত একটি দ্বীপের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে 'স্কুইরেল' নামে একটি মালবাহী জাহাজের নাবিকরা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করার মতই একদিন সন্ধান পেল পিয়ার্সনের। আর এই লোকটির সন্ধান করতে গিয়েই যত অনর্থ। তবে হ্যাঁ, প্রচুর নাকানিচুবানি খেয়ে শেষ পর্যন্ত পিয়ার্সনকে তারা খুঁজে পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশ।

পটভূমিকার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ভিন-দেশী চরিত্রের আশ্রয় নিয়েছি। কোন বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে মিল থাকলে সেটা অনিচ্ছাকৃত এবং আকস্মিক।

সমরজিৎ কর

একটি মাত্র মানুষের শয়তানি সারা পৃথিবীর বুকে যে কী দারুণ বিপর্যয় টেনে আনতে পারত, ঠিক এই মুহূর্তে সে কথা ভাবতে গিয়ে সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে আসতে চায়। লোকটার খামখেয়াল এবং উদ্ভট কল্পনার যেন তুলনা নেই! আরব সাগর থেকে আতলান্টিক, আফ্রিকার কয়েকটি দেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হাজার হাজার মাইল শুধু ঐ একটি মানুষকেই খুঁজে বের করার জন্যে আমাদের হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। পদে পদে বাধা। মৃত্যুভয়টা শেষ পর্যন্ত ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা। কি করে যে এখনও বেঁচে রয়েছি সেটাও নিজের কাছে কেমন যেন অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। মৃত্যু! অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে আমরা ছিটকে বেরিয়ে এসেছি, এই হল সার কথা। আর সেই লোকটা— ?

হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার ব্রিকহিলের অনুরোধেই সমস্ত ঘটনাটা আমি লিখতে বসেছি। স্কুইরেল নামে একখানি পনের হাজার টন জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি যখন এক দুঃসাহসিক অভিযানে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে ঘটনাচক্রে তাঁর অধীনে কিছুদিন নাবিক-জীবন যাপন করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। আর ঠিক এই সময়েই আমরা সকলেই অর্থাৎ মিঃ লকসলি, ডক্টর হে প্রভৃতি এমন একজন মানুষের কাছে নাকানিচুবানি খাই—যার মত ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক লোকের কথা ভাবতে গেলেও সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে আসে। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল একখানি চিঠিতে আমাকে জানিয়েছেন—মিঃ বোস, বিজ্ঞান নিয়ে যারা ছেলেখেলা করে, বিজ্ঞানে সাফল্য লাভ করে যারা পরের উপর প্রভুত্ব চালায় তাদের

নীচতার পরিচয় দেওয়ার জন্তেই আমাদের অভিজ্ঞতার কথাটা সকলকে জানানো উচিত···

কি ভাবে স্কুইরেলের সাহায্যে আমরা এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছিলাম, ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল যে শয়তান বিজ্ঞানীর কথা ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন, সেই ডক্টর পিয়ার্সনের গোলক ধাঁধা কি করে আমাদেরকে বিপদে ফেলেছিল এবং সেই সঙ্গে পুরো পৃথিবীটাকেও, এ তারই এক শ্বাসরোধকারী কাহিনী।

ব্যাপারটা বড় অদ্ভুতভাবে আমার চোখে পড়ল স্কুইরেলে চাকরি নেওয়ার মাত্র তিন দিন পর। জাহাজের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ক্যাপ্টেন মিঃ লকসলিকে সাহায্য করার ভার ছিল আমার উপর। কলম্বো হয়ে আমরা যাত্রা করেছিলাম মাদাগাস্কারের পথে। তারিখটা ছিল ৮ই মার্চ, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এরই মধ্যে জাহাজের সকলের সঙ্গে বেশ কিছুটা হৃদ্যতা জন্মে গিয়েছে। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল তো আমাকে 'ছেলে' বলেই সম্বোধন করে বসলেন। চাকরির প্রথম দিকে অবশ্য আমাকে বলা হয়েছিল স্কুইরেল এবার এক নতুন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে চলেছে। মালবাহী জাহাজ হলেও আপাতত কোন মাল বহন করার কাজ সে করবে না।

ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলকে আমার ভালই লাগল। ভদ্রলোক নিউ-অরলেন্সের লোক। বয়েস বছর পঞ্চাশেক। খুব বিচক্ষণ নাবিক এবং মৃদুস্বভাবী। তবে চাপা। তা হলেও বলা চলে, এঁর অধীনে আমরা সকলেই বেশ আনন্দে ছিলাম। যে 'নতুন অভিজ্ঞতা'র কথা আমাকে বলা হোল আসলে সে বস্তুটি যে কি, তা তখনও জানতে পারি নি। কর্তৃপক্ষও দেখলাম ব্যাপারটা নিয়ে খুব খোলাখুলিভাবে কথা বলতে চান না। কিন্তু তখনও কি জানতাম, তিন দিন পর—হ্যাঁ, মাত্র

তিন দিন পরেই আমি নিজেই এ বিষয়টা নিয়ে ভাবব? এ যেন কল্পনাও করা যায় না।

সেদিন নেভিগেসন ক্যাবিনে বসে কথা বলছিলাম মিঃ লকসলির সঙ্গে। ঘরোয়া কথাই। এমন সময় আমাদের সম্মুখে যে ম্যাপটি বিছানো ছিল তার উপর আমার চোখ গিয়ে পড়ল। বলে রাখা ভাল, এ ম্যাপটি বিশেষ ধরনের। আতলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল এতে দেখানো হয়েছিল। কোথায় ডুবো পাহাড় রয়েছে, কোথায় জলের গভীরতা কত প্রভৃতি পরিষ্কার করে এতে লেখা ছিল। ম্যাপের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে এসে পড়লাম হনলুলুর কাছে। তারপরই চোখে পড়ল হনলুলুর কাছে বিষুব-রেখাকে অতিক্রম করে যে দ্রাঘিমা রেখা সোজা মকরক্রান্তি অতিক্রম করেছে, তারই প্রায় ষাট ডিগ্রী দক্ষিণে একটি দ্বীপ্। দ্বীপটির উপর একটি লাল পিন গাঁথা রয়েছে। পাশে লেখা: চার নম্বর দ্বীপ।

সারা ম্যাপের মধ্যে এই অভিনবত্বটুকু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মিঃ লকসলিকে তাই প্রশ্ন না করে পারলাম না—স্যার, এটা আবার কোন্ দ্বীপ?

আমার এই প্রশ্নের জন্য মিঃ লকসলি বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না। একটু চমকে উঠলেন যেন তিনি। চোখমুখে ফুটে উঠল একটা আতঙ্ক। বেশ বিহ্বল ভাব। নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ঐ দ্বীপের উপর। তারপর বললেন, মিঃ বোস, সমস্ত কিছুই ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল তোমাকে জানাবেন। আপাতত কতকগুলি সমস্যা নিয়ে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন। দু-একদিনের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে আমরা আসব। তারপর একে একে সব কিছুই জানতে পারবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো এর পেছনে রয়েছে এক প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্র—বিভীষিকাময় কার্যকলাপ।

মিঃ লকসলির উত্তর শুনে একটু বিচলিত হলাম। 'একটি নতুন অভিজ্ঞতা'র যে কথা পূর্বে বলা হয়েছিল সেটা কি এই দ্বীপকেই ঘিরে? মোটকথা সমস্ত কিছুই আমার কাছে যেন হেঁয়ালি বলে মনে হোল। সেদিনের মত কোন নতুন আলোচনা করা আর সম্ভব হোল না।

পরদিন সন্ধ্যায় স্বয়ং ক্যাপ্টেনের কক্ষে আমার তলব পড়ল। আমি যেতেই তিনি আমাকে বসতে বললেন।

বসলাম।

মিঃ ব্রিকহিল নিবিষ্টমনে একটি ডায়েরি পড়ছিলেন। তাঁর পাশের টেবিলটার উপর একটি বিরাট ম্যাপ শোয়ান। একটা উজ্জ্বল আলোয় তার কিছুটা জায়গা খুব স্পষ্টই চোখে পড়ছিল। আর চমকাতে হোল এখানেও। একটা লাল পিন! রক্তমাখা একফালি সাপের জিভ গেঁথে রয়েছে ম্যাপের বুকে। অজানিত আশঙ্কায় সারা দেহ যেন একবার কেঁপে উঠল আমার।

মিঃ ব্রিকহিল কিছুক্ষণ ধরে ডায়েরির পাতা উল্টালেন। মাঝে মাঝে দু-একছত্র করে পড়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। নীরব ক্যাবিনের মাঝে মাথার উপরকার উজ্জ্বল আলোয় মনে হোল ঐ লাল পিনের চেয়ে ক্যাপ্টেনের চুপ করে থাকাটা যেন আরও ভয়ঙ্কর।

কাটল দশ মিনিট। তারপর ডায়েরির একটি পাতাকে চিহ্নিত করে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন তিনি: ক্ষমা করো, মিঃ বোস তোমাকে বেশ কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।

আমি বললাম, আপনি খুব ব্যস্ত।

আরে না না। লকসলির কাছে তোমার কথা শুনলাম। ভাল। খুব ভাল। এর মধ্যে বেশ মানিয়ে নিয়েছ।...একটু থেমে বললেন,

তোমরা, বাঙালীরা অল্পদিনের মধ্যে যে কোন পরিবেশকে বেশ আপনার করে নিতে পার।···একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—মিঃ মিটারও এমনিই ছিল। ঈশ্বর তার আত্মার মঙ্গল করুন।

মিঃ মিটার ?

হি ওয়াজ এ বেঙ্গলী লাইক ইউ। খুব ভাল ছেলে ছিল সে। কিন্তু বেচারা !

এবারে রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা খুলে বলুন স্যার !

ঐ লাল পিনটা দেখছো ? বেশ নাটকীয় ভাবে বললেন মিঃ ব্রিকহিল।

মিঃ লকসলির টেবিলে ওরকম আর একটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

সে কি তোমাকে কিছু বলেছে ?

না।

তা হলে জেনে রাখো, এই একটি পিন একটি মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

বলেন কি স্যার ?

হ্যাঁ। মিঃ মিটার এই পিনের খোঁচাতেই মরেছে। তারপর বিড়-বিড় করে নিজের মনেই বলতে লাগলেন—কিন্তু কেন ? কি ভাবেই বা এই পিন এলো ? অদ্ভুত একটা আওয়াজ কারা তুলেছিল, ঐখানে—ঐ যে পিন বেঁধানো, ঐ দ্বীপটায় ?

একটু যেন উত্তেজিত হলেন মিঃ ব্রিকহিল।

বললাম, ক্যাপ্টেন, যদি কিছু মনে না করেন, অনুগ্রহ করে মিঃ মিটারের পরিচয় জানালে খুশী হতাম।

আমি সে কথাটা বলার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। কতকটা

আত্মগতভাবে বলে গেলেন মিঃ ব্রিকহিল ঃ আমি জানি সমস্ত ব্যাপারেই তোমার সাহায্য পাব।

ডায়েরিটা এবার তিনি তুলে দিলেন আমার হাতে। একটি বিশেষ স্থান থেকে পড়ার জন্যে আমাকে অনুরোধ করলেন। তারপর পাশের ম্যাপটির উপর ছক কেটে কেটে কি সব পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন তিনি।

আমি ডায়েরি পড়তে লাগলাম। লিখেছেন মিঃ ব্রিকহিল স্বয়ং ঃ

৬ই মে, ১৯৩৫। ঝড়ো আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে আমরা পথ ভুল করেছি। যে দ্বীপটির কাছে আমাদের জাহাজ নোঙর করে রয়েছে তার পরিচয় আমার অজানা। সম্ভবতঃ আমরা কোন নতুন দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছি যার ঠিকানা আমাদের জানা নয়। কিন্তু আজ রাত্রে মিঃ লকসলি দ্বীপের এক স্থানে তীব্র আলোর একটা সারি লক্ষ্য করেছে। বিভিন্ন রঙের। ওরা নাকি জ্বলেই নিভে গেছে। দেখছি রীতিমত ভৌতিক ব্যাপার। কাল দ্বীপটিতে আমরা অনুসন্ধান চালাব ঠিক করেছি। সঙ্গে যাবে মিঃ লকসলি, ডাক্তার হে, সহকারী মেরিন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মরগ্যান এবং আমার কন্যা লরা। লরা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের ছাত্রী। এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহী। সঙ্গে দু'চারজন মেটও থাকবে। মিঃ মিত্র আজ দুপুরের দিকে একবার মিঃ মরগ্যানের সাথে দ্বীপটিতে নেমেছিল। ওরা কতকগুলি ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়ী লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কোন লোক দেখেনি। ওরা ভাবছে হয়ত একটা ঐতিহাসিক স্থানে আমরা এসে পড়েছি।······কিন্তু মিঃ লকসলি তো আমাকে দমিয়ে দিচ্ছে। মানুষ নেই এমন দ্বীপে আলো এল কোত্থেকে ?

৭ই মে, ১৯৩৫। অদ্ভুত ! অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ! একেবারে প্রাণঘাতী

বলা চলে। আজ সকালে একটি মোটর লঞ্চে করে আমরা দ্বীপটির চারপাশটা ঘুরে নিয়েছি। সময় লেগেছে ঘণ্টা ছয়েক। উঁচু নিচু পাহাড়। মাঝারি ধরনের গাছপালা আর ঘাস চারদিকে জঙ্গল করে রেখেছে। চোখে কোন লোকজন পড়েনি। দুপুর দু'টোর সময় আমাদের দল একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে এগতে থাকে। প্রায় সিকি মাইল এগনোর পর একটা গাছের সম্মুখে এসে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে যাই। ব্যাপারটা আমার মেয়ের চোখেই প্রথমে পড়েছিল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক তার একশ' ফুট দূরে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের গায়ে একটি গাছের সঙ্গে মানুষের মাথার খুলির একটা বিরাট মালা ঝুলছিল। মালাটি কম করেও চল্লিশ ফুট লম্বা হবে। ভেবেছিলাম, তা হলে কি আমরা কোন আদিম মানুষের দেশে এসে পড়লাম? সকলেই নিজ নিজ অস্ত্র প্রস্তুত রেখে আবার এগতে লাগলাম।

লরার মধ্যে কিছুটা উৎসাহ লক্ষ্য করলাম। পৃথিবীর সুপ্রাচীন যে সমস্ত সভ্যতার পরিচয় আমরা মিশর, মধ্য এশিয়া, গ্রীস, ভারতবর্ষে দেখতে পাই, ঠিক তেমনই এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মেক্সিকোতে। এর নাম মায়ার সভ্যতা। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা এবং বিজ্ঞানে এরা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। তারপর এল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ঝড়, ভূমিকম্প। সমস্ত ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। প্রাণের তাগিদে সেখানকার অধিবাসী ছড়িয়ে পড়ল এখানে সেখানে।—তা হলে কি তাদেরই চিহ্ন এই দ্বীপে— ?

লরা হয়ত আরও কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হোল না।

উঃ! একটা মর্মান্তিক শব্দ ভেসে এল পেছন দিক থেকে। চমকে সকলেই আমরা পেছনের দিকে চাইলাম। দেখলাম, আমাদের সারির শেষে মিঃ মিটার হটাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে।

মিঃ লকসলি বলল, কি ব্যাপার? কাছে গিয়েই দেখলাম একটা লাল পিন মিঃ মিত্রের জুতোর হিলে গেঁথে রয়েছে।

পিন? পিন এল কোত্থেকে? আর তা ছাড়া সামান্য পিন ঐ শক্ত দুই ইঞ্চি পুরু বুটের গোড়ালি ভেদ করেই বা কি করে? কিছুক্ষণ আমরা সকলেই নির্বাক রইলাম।

মিঃ লকসলি বলল, ওঠ। ওঠ! ইয়ং ম্যান।

কিন্তু পরক্ষণেই ঢলে পড়ে গেল মিঃ মিটার। ডাক্তার হে পরীক্ষা করে জানালেন, মিঃ মিটার ইজ ডেড।

ডেড?

আমার শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুতের শক্ লাগল। মিঃ মিটারকে ঐখানেই কবর দিয়ে আমরা আজকের মত সকলেই ফিরে এসেছি। কিন্তু কোত্থেকে এল ঐ লাল পিন? মিঃ মিটারের মৃত্যুর কারণ কি ঐ? পিন যখন পাওয়া গেছে, তখন সভ্য মানুষও এখানে আছে। কিন্তু কারা তারা?

তখনও ভাবিনি কি দারুণ এক পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। রীতিমত দুশ্চিন্তা নিয়ে জাহাজে যখন সকলেই আমরা এ ওর মুখের দিকে চাইছি ঠিক এই সময় আমাদের এক নাবিক মিঃ লরেন্স এল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে।

কি ব্যাপার? প্রশ্ন করলাম আমি।

দারুণ কাণ্ড! পিন! সেই পিন স্যার!

ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল লরেন্স। ভয়ে তার সারা মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

আসল ব্যাপারটা কি, তাড়াতাড়ি বল। বেশ বিরক্তির সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম আমি।

ডিকের জুতোর গোড়ালিতে সেই পিন! আমাদের ডাক্তারবাবু স্ট্যানলির চোখে সেটা পড়ে। ডিক তো ভয়েই আধমরা। তবু রক্ষে, ওটা ওর গায়ে বেঁধেনি।

পিন ?   লাল পিন ?

ছুটলাম আমি ডাক্তার স্ট্যানলির ক্যাবিনে। সেখানে গিয়ে দেখি জ্যান্ত সাপের জিভের মত একটি লাল পিন পরীক্ষা করছেন ডাক্তার স্ট্যানলি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উপর সারা দেহ ঝুঁকে রয়েছে তাঁর। তাঁকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। মনোনিবেশ সহকারে সেটা যে তিনি পরীক্ষা করছেন তা বোঝা গেল। আমরা নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ তুললেন ডাক্তার স্ট্যানলি।

কি ব্যাপার, ডাক্তার ? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম।

সবুজ পাতার রস ! এর মধ্যে ক্লোরোফিল পাওয়া গেছে। অত্যন্ত বিষাক্ত। কি অদ্ভুত এর ক্ষমতা ! এতটা বসন্তের জীবাণুকে কী অল্প সময়ের মধ্যেই না এ মেরে ফেলল !

ডাক্তার স্ট্যানলির চোখের মধ্যে ফুটে উঠল বিস্ময় এবং ভীতি। আস্তে আস্তে বললেন, মিঃ মিটার এই কারণেই মারা গেছেন। ব্যাচারা ডিক বেঁচে গেছে, কারণ দৈবাৎ এটা জুতোর গোড়ালি ফুটো করে ওর চামড়ায় গেঁথে যেতে পারে নি।

একে একে সব যেন আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। ডিকের পায়েই বা পিন এল কোত্থেকে ? যতক্ষণ ও বনের মধ্যে ছিল, কই, কিছু তো ও বলে নি ?

তখনকার মত কোন সিদ্ধান্তেই আসা আর গেল'না।

কিন্তু সেদিন রাত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটল সেটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, মুহূর্তের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার পক্ষে আর কোন উপায় ছিল না। গভীর রাত। সম্ভবতঃ ঘড়িতে তখন দু'টো বাজে। একটা দারুণ নিস্তব্ধতা সমস্ত জাহাজ জুড়ে বিরাজ করছে। দুশ্চিন্তা নিয়ে একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে কখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছি। এমন সময়

একজন নাবিক, নাম ফার্নানডো ছুটে এসে একরকম ঠেলেই তুলল যেন আমাকে।

চমকে উঠে বললাম, কি খবর ?

সর্বনাশ হয়ে গেল স্যার! লরাকে ওরা নিয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে কথা বলল ফার্নানডো।

ব্যাপারটা যেন বিশ্বাস করা যায় না। শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়াতে পারে ? মনে হোল জগতের চারদিকে আমাকে নিয়ে যেন একটা ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। ভুলে গেলাম সব কিছু। জাহাজের বিপদজ্ঞাপক সুইচটি টিপে ধরলাম। ক্যাবিনে ক্যাবিনে ঘণ্টা বেজে উঠল। চীৎকার করে উঠল আকাশ-বিদারী সাইরেন। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে চুরমার করে হন্তদন্ত হয়ে সকলেই ছুটে এল। মিঃ লকসলির হাতে রাইফেল।

মিঃ লকসলিকে দেখে আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। বললাম, আমার মেয়ে লরাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, অফিসার !

মিঃ লকসলি কিন্তু ভেঙ্গে পড়ল না। আমাকে একটু শান্ত হওয়ার উপদেশ দিয়ে সে সোজা চলে গেল বাতিঘরে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং আমি তাকে অনুসরণ করলাম। বাতিঘর থেকে তীব্র সার্চ-লাইট ফেলা হতে লাগল সমুদ্রের বুকের উপর। কিন্তু হায়! কোন কিছুই আমাদের চোখে পড়ল না। আমি উন্মাদের মত এদিকে সেদিকে ছোটাছুটি করতে লাগলাম। তীব্র সার্চ-লাইটের মধ্যে দিয়ে দূরবীন চালিয়ে সমুদ্রের প্রতিটি তরঙ্গকে আমরা আঁতিপাঁতি করে পরীক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সব বৃথা! ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ক্যাবিনে ফিরে এলাম আমরা।

নাবিক ফার্নানডো বলল, যখন সে প্রহরারত অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছিল হঠাৎ কিসের শব্দ সে শুনতে পায় লরার ক্যাবিনের কাছ

থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায়। বাইরে থেকে কান পেতে সে শুনতে থাকে ক্যাবিনের মধ্যে কে যেন পায়চারি করছে। ব্যাপারটা কি তা বোঝার আগেই ক্যাবিনের দরজা খুলে যায়। লক্ষ্য করে প্রায় সাত ফুট লম্বা দু'জন দানবের মত মূর্তি ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এল। দু'জনেরই আপাদমস্তক কালো মুখোশে ঢাকা। মাথার উপর মনে হোল টুপির সঙ্গে লাগানো দুটি করে বাল্ব। একটাতে নীল এবং অপরটিতে লাল আলো জ্বলছিল আর নিভছিল। অদ্ভুত সে আলো। যদিও তারা খুবই ক্ষীণ কিন্তু চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ পিয়ার্সনের মনে হোল তার সারা দেহ যেন অবশ হয়ে যাবে। মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ল ওদের দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে লরা। না না, জাহাজের ক্ষীণ আলোতে তাকে চিনতে মোটেই তার ভুল হয় নি। লরাকে যেন খুব নিস্তেজ বলেই মনে হচ্ছিল।···ওরা দুজন লরাকে ধরে জাহাজের উপর থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে—এ ব্যাপারটাও মিঃ পিয়ার্সন লক্ষ্য করেছে।

মিঃ লকসলি সমস্ত ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, এত বড় স্পর্ধা! সভ্যজগতের একজন মানুষকে এভাবে চুরি করে নিয়ে যাওয়া—না, না, এ সহ্য করা চলে না। আমরা এক্ষুণি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঐ দ্বীপে নামব। নিশ্চয় ওখানে কতকগুলি ফন্দিবাজ লোক বাস করে। এইভাবে ভয় দেখিয়ে ওরা কিছু মতলব হাসিল করতে চায়। আমি ভুল করি নি। কারণ ঐ দ্বীপে যাওয়ার পর থেকেই আমাদের উপর যতসব অঘটন ঘটছে।

মিঃ লকসলির কথায় আমরা প্রত্যেকেই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তখনও জানতাম না, প্রতিপক্ষও কম সেয়ানা নয়। আমরা যখন উত্তেজিত হয়ে এবার কি করা যায় তা ভাবছি, এমন সময় একজন নাবিক দৌড়তে দৌড়তে এসে আমার হাতে একটি কাগজের টুকরো

তুলে দিল। কম্পিত হাতে সেটা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম আমি ঃ ক্যাপটেন ব্রিকহিল, এখনও সাবধান! এই দ্বীপে অবতরণ করে নিজেদের বিপদ টেনে এনে বোকার মত পরিচয় দেবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। মিঃ লকসলি যতই চীৎকার করুক, আমাদের সঙ্গে মোলাকাত করে কোন সুফল হবে না। আপনার কন্যা লরাকে আমরা নিয়ে এসেছি। তার প্রাণের ভয় করবেন না। যথাসময়ে তাকে আমরা ফেরৎ পাঠাব। তাকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন না। মিঃ মিটার, যাকে আমরা হত্যা করেছি, সে আমাদের একটি মানচিত্র পেয়েছে। সেটি সে দেয় ডিককে ঐ দ্বীপেই। ডিককেও আমরা হত্যা করার চেষ্টা করি। কিন্তু তার সৌভাগ্য সে বেঁচে গেল। মানচিত্রটি মিঃ লকসলির কাছে আছে। এ খবর আমরা রাখি। ওটি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না পাচ্ছি, লরা আমাদের হাতে বন্দীই থাকবে। যদি ওটা উদ্ধার করে ফেরৎ দেন, বাধিত হব। ইতি, আপনার বিশ্বস্ত, মিঃ— ?

চিঠির শেষে লেখক নিজের নাম গোপন করে গেছে।

চিঠিটি পড়েই অবাক হয়ে তাকালাম মিঃ লকসলির দিকে।

যে নাবিকটি এই চিঠিটি এনেছিল তার দিকে চেয়ে বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিঃ লকসলি, এটি পেলে কোথায় ?

নাবিক বলল, এই মাত্র দরিয়া থেকে এসে পড়ল ঐ মাস্তুলের কাছে। আমি ওখানে কাছি পরীক্ষা করছিলাম।

কিন্তু সকলেই আমরা বিস্মিত হলাম একথাটা ভেবে যে, জাহাজে এইমাত্র লকসলি আমার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলল, কি বলল, সে কথাই বা শত্রুপক্ষ জানল কি করে ? তা হলে কি আমাদের মধ্যেই শত্রুর চর গা ঢাকা দিয়ে বাস করছে ? কিন্তু ম্যাপ ? মিঃ লকসলি তো কোন ম্যাপের কথা আমাকে বলে নি ? আমরা তার দিকে তাকাতেই একটু

যেন বিব্রত বোধ করল সে। তারপর বলল, মাফ করবেন, ক্যাপটেন, মিঃ ডিকের পকেট থেকে উদ্ধার করে বস্তুটিকে আমার হাতে দিয়েছেন ডাক্তার স্ট্যানলি। ডাক্তার হে'ও ওটিকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। আমরা ওর কিছুই বুঝতে পারি নি। আসলে ওটি যে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু, তাও ভাবি নি।

ব্যাপারটা জানার পর ঠিক করলাম, পরদিন ভোরে ম্যাপটি মিঃ লকসলির কাছ থেকে নিয়ে ঐ দ্বীপে ফেলে দিয়ে আসব। কিন্তু হায়। তা আর হোল না। সেই রাত্রেই নামল তুষার-ঝড়। এ সময়ে হঠাৎ এরকম ঝড় এদিকে হয়। এইসঙ্গে কখনও কখনও সমুদ্রের জলও জমে বরফ হয়ে যায়। পাছে বরফে আমরা এতগুলি প্রাণী আটকে পড়ি, একজনকে রক্ষা করতে গিয়ে এতগুলি প্রাণ পাছে নষ্ট হয়, একথা ভেবেই নিজের কষ্টকে যথেষ্ট বাড়িয়েও আমি হুকুম দিলাম, নোঙর তোল।

মিঃ লকসলি একবার বাধা দিল, সে কি করে সম্ভব, স্যার ?

এবারে আমি ঝানু ক্যাপ্টেনের মত জবাব দিলাম—এটাই আমার আদেশ।

এরপর কেউ আর আমার সম্মুখে আসে নি।

২

তারপর কেটেছে বেশ কয়েক বৎসর। মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে তিনবার আমি ঐ প্রাণঘাতী দ্বীপে অভিযান চালাই। কিন্তু বার বারই আমরা ব্যর্থ হয়েছি। মিঃ লকসলি যে ম্যাপটি যোগাড় করেছেন, তা আমি দেখেছি। দেখে রীতিমত চমকে উঠেছি। একটা ভয়ঙ্কর মানুষ এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে সেখানে গবেষণা করছে, যাদের কথা ভাবলেও শিউরে উঠি। শুধু মেয়েকে উদ্ধার করতে হবে, এটাই আজ আর আমাদের কাছে বড় সমস্যা নয়। সেই ধূর্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী শয়তানকে আমাদের ধরতে হবে। নইলে পৃথিবীর মানুষ

কখনই আর বাঁচবে না। আমরা প্রত্যেক অভিযানেই ঐ সাত ফুট লম্বা মুখোশধারী দুইজন মূর্তিকে দেখতে পেয়েছি। ওদের উপর আমরা গুলিও ছুঁড়েছি। কিন্তু ওদের মাথার ঐ নীল আর লাল আলো আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে গুলিয়ে দিয়ে বার বার আমাদেরকে বিপদে ফেলেছে। কে তারা? মানুষ? দানব? না আর কিছু? সেটা জানার জন্যেই এবার শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখতে হবে।

ডায়েরির শেষ পাতা ওল্টালাম।

থামলাম আমি।

ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল বললেন, আশা করি ব্যাপারটা বুঝছ, মিঃ বোস?

আমি বললাম, নীল আলোটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কি রকম মনে হয়েছিল, ক্যাপ্টেন?

আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব!

আপনি কি মনে করেন, ওরা মানুষ?

ওদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝি নি।

একটু থেমে আমি বললাম, আমি আশা রাখি আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব। মনে রাখবেন, যাদেরকে আপনি দেখেছেন, ওরা মানুষ নয়, এই আমার বিশ্বাস। ভবিষ্যতে আমাদেরকে আরও হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে।

ক্যাপ্টেন বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

সেদিন রাত্রে ভারাক্রান্ত মনেই ফিরলাম নিজের ক্যাবিনে। পরিচারক খাবার ঢেকে রেখে গিয়েছিল। খেলাম। তারপর ক্লান্ত

দেহটি ছড়িয়ে দিলাম শয্যার উপর। সিলিং-এ নীল আলো। জাহাজের একটানা ঘর ঘর শব্দ। আর সামুদ্রিক বায়ুর উচ্ছ্বাসের একটানা আওয়াজ। তার মাঝে অনেক কথা মনে পড়ল।

মনে পড়ল সংসারে আমার কেউ নেই। ছোটকালেই বাবা-মাকে হারিয়ে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, শত মানুষের উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা নিয়ে একদিন কেমন করে বেড়ে উঠলাম। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লাম। জাহাজে চাকরিও হোল। তারপর? তাতেও তো অনেক বাধা! অন্তত ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল আজ যা জানালেন, তার ভেতর থেকে তো একটি সাবলীল নাবিক জীবনের স্বাদ পাব বলে মনে হয় না! লরাকে চুরি করার কারণ কি? তাকে ওরা হত্যা করবে না তো? ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল অবশ্য অনেক কথাই যেন অস্পষ্ট রেখে যাচ্ছেন। মিঃ লকসলি যে ম্যাপটি পেয়েছেন, সেটা কিসের? ব্রিকহিল মনে করেন, ঐ রহস্যময় দ্বীপকে ঘিরে নাকি চলেছে বিরাট এক অভিসন্ধি। কারা ওখানে থাকে, পৃথিবীর সভ্যজগৎ সে খবর রাখে না। কিন্তু তাঁর ধারণা, একটা কিছু হচ্ছে সেখানে। আর তা এমনই যার দ্বারা পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষের প্রাণ হবে বিপন্ন।

একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম ক্যাপ্টেনকে, হঠাৎ এই ধারণার কি কারণ হতে পারে, স্যার?

ব্রিকহিলের সারা মুখে লক্ষ্য করলাম একটা অদ্ভুত পাণ্ডুরতা। বললেন, কেন? সে কথার সঠিক উত্তর দেওয়া এখনই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমি নিজেই সমস্ত কিছু বুঝে উঠতে পারি নি।

এই ভাবে যখন নানা রকম চিন্তা আমার মধ্যে আনাগোনা করছিল, ঠিক সেই সময়, রাত তখন বারোটা প্রায়, পাইলটের কাছ থেকে আমার ডাক এল। আমার ক্যাবিনের টেলিফোনে ঘণ্টা বাজল। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রটি তুলে নিলাম।

হ্যালো! আমি মিঃ বোস বলছি।

তাড়াতাড়ি একবারটি নেভিগেসন কক্ষে আসতে হচ্ছে। জরুরী!··· কথা বলল পাইলট মিঃ বিল।

কি ব্যাপার? এবার আমার কণ্ঠে বিস্ময়।

আমরা নিজেরাই বুঝছি না। জাহাজ তার গন্তব্য পথে যাচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে।

তার মানে? চমকে উঠলাম।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে একেবারে ঘুমের পোশাক পরেই ছুটে এলাম নেভিগেসন কক্ষে। দেখি এর মধ্যেই মিঃ লকসলি এবং ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সকলের চোখে মুখেই একটা ভয়ার্ত ভাব।

আমি উপস্থিত হতেই মিঃ লকসলি বললেন, একেবারে তাজ্জব কাণ্ড, মিঃ বোস। রাডার ঠিকমত কাজ করছে না। আমাদের জাহাজ তার গন্তব্য পথ ছেড়ে একটু বেঁকে গেছে এবং আমরা অন্য দিকে চলেছি। অন্তত বলা চলে বিগত তিন ঘণ্টা ধরে চলেছি এবং চলতামও কত ঘণ্টা ধরে কে জানে, যদি না আমাদের ঝানু পাইলট মিঃ বিল ব্যাপারটা ধরে ফেলতেন।

তার মানে? কতকটা বিভ্রান্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মিঃ বিল বললেন, ধরা পড়ল আমারই চোখে। সেকসট্যাণ্ট নিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই আকাশের নক্ষত্র দেখার ইচ্ছে হোল রাত সাড়ে এগারোটায়। হঠাৎ চমকে উঠলাম আকাশের তারা দেখে, আমরা যেন আমাদের পথ থেকে একটু বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর চলেছি।

তারপর ম্যাগনেটোমিটার বা কম্পাস লক্ষ্য করেন নি? আমার প্রশ্ন।

একটা ফ্যাকাসে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মিঃ বিলের মুখের উপর।

যেন সে হেরে গেছে, এমন ভাবে বলল, আপনাকে কি বলছি মশায়। ঐ কম্পাস শয়তানটাই তো আমাদেরকে ভুল পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমি তো ওকে লক্ষ্য করেই এতক্ষণ জাহাজ চালাচ্ছিলাম। এটা কি জানতাম ও আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ?

ব্যাপারটা খুলে বলুন, মিঃ বিল !

আসল কথা হোল কম্পাসের কাঁটা এতক্ষণ ঠিক উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ছিল না। একটু বেঁকে ছিল। অন্তত এই কয়েক মিনিট আগেও, যখন এঁরা কেউ এখানে আসেন নি।

মিঃ বিল অন্যান্য অফিসারদেরকে দেখাল।

তারপর কখন এটা ঠিক হোল বুঝলেন ?

মাত্র মিনিট দশেক আগে। যখন বিভ্রান্ত হয়ে নানা দিক লক্ষ্য করছিলাম, আমার ক্যাবিনের ঠিক ঐ কোণটায়, ঐখানে হঠাৎ একটা হলুদ রঙের আলো মুহূর্তে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। মিঃ বিল কম্পাসের অনতিদূরে একটি ছোট্ট র‍্যাক দেখাল। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, চমকে দেখলাম, কম্পাস কাঁটা যেন কেঁপে উঠল একটু : একটু যেন সরেও গেল। তারপরই সে ঠিক নির্দেশ দিতে লাগল, অর্থাৎ আগের মতই উত্তর-দক্ষিণ বরাবর দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ভাবলাম, এ কি রকম হল ? ব্যাটাচ্ছেলে তাহলে কি এতক্ষণ আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছিল ? হ্যাঁ ! যা ধরেছি, নজর দিতেই ধরে ফেললাম, আমরা যেন অনেকক্ষণ ধরে অন্য পথে চলেছি। মাথাটা গুলিয়ে যাবার মত অবস্থা আমার। কম্পাসের কাঁটার কি শেষে একটি মগজ বেরুল, যে ইচ্ছে মত সে চলা ফেরা করছে ? কি করে সে এতক্ষণ দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর ছিল ? আবার কেনই বা আগের মত ঠিক হয়ে গেল ? কিন্তু তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার, যে কারণে আমি ঘাবড়ে গেছি, সেটা হোল, ঐ হলুদ আলো জ্বলল কোথেকে ? আর

কেই বা জ্বালাল ? কোন বাল্ব তো ওখানে নেই ! বাইরের আকাশও তো পরিষ্কার। অতএব বাইরের বিদ্যুৎচমকানি হঠাৎ যে আমার চোখে একটা ধাঁধাঁ সৃষ্টি করে গেল, একথাই বা বিশ্বাস করি কি করে ?

মিঃ বিলের কথায় আমরা র‍্যাকটিকে পরীক্ষা করলাম। কোন কিছুই সেখানে দেখতে পেলাম না। তবে স্টিলের র‍্যাকটির খানিকটা অংশ একটু বিবর্ণ হয়েছে, এই যা নতুনত্ব। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই আমরা নিতে পারলাম না।

মিঃ লকসলি বললেন, তোমার কি মনে হয়, মিঃ বোস ? কম্পাসের কাঁটা তার নিজস্ব লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, এ যে একেবারে ভৌতিক কাণ্ড !

ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল বললেন, ভৌতিক হলেও ব্যাপারটা সত্যি। কারণ মিঃ বিল আমাদের নির্ভরযোগ্য পাইলট। ওর কোন ত্রুটি থাকতে পারে না। একটা অস্বাভাবিক কিছু যে ঘটেছে, এ সম্পর্কে আমার আর দ্বিমত নেই।

প্রত্যেকের মধ্যেই যে একটা অজানা আশঙ্কা উঁকি মারতে লাগল মুখে কেউ আমরা তা প্রকাশ না করলেও সকলেই বুঝলাম।

তা হলে কি এখানেও শত্রুর হাতছানি ? তখনকার মত পাইলটের ক্যাবিন থেকে ফিরে এসে এ কথাটাই কেন যেন আমাকে ভাবিয়ে তুলল। র‍্যাকের ঐ স্থানটি বিবর্ণ হোল কেন ? মিঃ বিল যে আলোর ঝলসানির কথা বলল, সেটারই বা কারণ কি ? আর তা ছাড়া সুরক্ষিত কম্পাসের কাঁটার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিজের লক্ষ্য থেকে সরিয়ে রাখা—এ যেন কাল্পনিক রোমাঞ্চকর গল্পের মত মনে হচ্ছে !

পরদিন ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলের ক্যাবিনে আমার ডাক পড়ল। যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে খুব বিমর্ষ এবং অন্যমনস্ক

বলেই মনে হচ্ছিল। আমি নীরবে তাঁর সম্মুখের আসনে গিয়ে বসলাম।

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মিঃ বোস, সম্ভবত দু'মাসের মধ্যেই আমরা আতল্যান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে যাব। তার আগে প্রথমে মাদাগাস্কার, সেখান থেকে জাঞ্জিবার।

জাঞ্জিবার? একটু চমকে উঠলাম আমি।

হ্যাঁ। মানে মাদাগাস্কারেই আমাদের জাহাজ খালি হয়ে যাবে এবং জাঞ্জিবার থেকে একটি কোম্পানির কিছু মশলা বয়ে নিয়ে দিতে হবে নিউ-অরলেন্সে।

কিন্তু এমন তো কোন কথা ছিল না, স্যার? মানে জাঞ্জিবারে নোঙর করতে হবে একথা তো আগে বলেন নি?

বুকিংটা হঠাৎ এল বেতার মারফত। আমার এক পরিচিত এজেন্সির মারফত ঐ মালগুলি পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ আমাকে করা হয়েছে। যাক ভালই হোল। খালি জাহাজ নিয়েই তো ফিরতে হোত?

এতে কি আমাদের অভিযান পর্বটা বিলম্বিত হবে না?

না। কারণ মোটামুটি সব ব্যবস্থা করতে সময়েরও তো প্রয়োজন। আমি আপাতত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম। তা মঞ্জুর হয়েছে। ওঁদের বিজ্ঞান এবং সমরবিশারদরা আমার কাছ থেকে সমস্ত কিছু জেনে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। অস্ত্র এবং সৈন্য দিয়ে ওঁরা আমাকে সাহায্য করবেন, এ কথাও বলেছেন।

কতকটা বাধা দেওয়ার ভঙ্গীতেই আমি বললাম, বলেন কি স্যার? এ যে রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন। ঠিক ওভাবে এগিয়ে গেলে শত্রুপক্ষ হয়ত ক্ষেপে যেতে পারে। আপনার মেয়ে লরার কথাটা ভেবেই আমি এই মন্তব্য করছি, ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল!

আমার এই কথায় সাময়িক একটা বিমর্ষভাব তাঁকে ঘিরে রাখলেও মুহূর্তের মধ্যে তা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, আমি জানি, মিঃ বোস। হয়ত লরাকে আমি ফেরৎ পাব না। আমার স্ত্রী-পুত্র সব গেছে। আমার অত্যন্ত আদরের মেয়ে লরা, হয়ত সেও যাবে। কিন্তু একথা আরও ভয়ের, সমস্ত বিশ্ববাসী আজ মাত্র একটি মানুষের কব্জার মধ্যে চলে যেতে বসেছে। হয়ত ভাববে, আমি প্রলাপ বকছি। তা নয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে এমন কতগুলি তথ্য আমি পেয়েছি এবং পাব বলে আশা করছি যাদের মত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পৃথিবীর মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

একটু থামলেন ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল। তারপর খুব ধীরকণ্ঠে বললেন, মাইয়ামিতে গত ৩রা মার্চ একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা হয় এবং সেই দিনই সাহারার এক স্থানে বিস্ফোরণ ঘটে, পর্যবেক্ষকরা যাদেরকে নিয়ে কোন নতুন কথাই শোনাতে পারেন নি। একটাকে ওঁরা প্রকৃতির তাণ্ডব, আর একটাকে ভয়াবহ উল্কাপাত, এই কথা বলেছেন। কিন্তু শুনলে অবাক হবে, নিউ-অরলেন্স থেকে যে তথ্য আমার কাছে এসে পৌঁছেছে, তাতে বলা হয়েছে, সাহারার বিস্ফোরণ প্রাকৃতিক নয়। এর পেছনে মানুষের হাত আছে।

কিন্তু কে সে? উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।

সেটাই একমাত্র প্রশ্ন! বললেন ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল।

সেই অভিশপ্ত দ্বীপের সঙ্গে কি এর কোন সম্পর্ক আছে?

আপাতত সেটাই এখন দেখতে হবে। তোমরা একটু সাবধানে থেকো। কখন যে বিপদ আসতে পারে কে জানে? মিঃ লকসলির সেই ম্যাপটিই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। ওটাকে খুব গোপনে রাখতে হবে। জাহাজের সাধারণ লস্কররা এ বিষয়ে যেন কিছু না জানতে পারে সেটা দেখবে।

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে নিজের ক্যাবিনে ফিরে এলাম।

এরপর কয়েক দিনের মধ্যেই মাদাগাস্কারের কাজ শেষ করে স্কুইরেল এগিয়ে চলল জাঞ্জিবারের পথে। ভারত মহাসাগরের তরঙ্গমালার উপর নেমে এসেছে যেন একটা ভয়াবহ রহস্যের হাতছানি। তারও ওপারে আমরা চলে যাব। যাব সেই রহস্যের দ্বীপে। কিন্তু কি আছে সেখানে? ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল যা যা বললেন তার মধ্যে অনেক কথাই যেন না বলা থেকে গেল।

তারপরই জাঞ্জিবার!! পাঁচদিন পর জাঞ্জিবারে জাহাজ ভিড়ল। আর জাঞ্জিবারে এসে যে একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, সে কথা স্বপ্নেও কি ভেবেছিলাম?

ছোট্ট শহর জাঞ্জিবার। আর যা কিছু এর জনসমাগম তা এর বন্দরটিকেই কেন্দ্র করে। পৃথিবীর নানা দেশের ব্যবসায়ীরা এখানে বাস করে। তবে তার মধ্যে ভারতীয়, আরব এবং ফরাসিদের সংখ্যা বেশী বলে মনে হোল। এখানকার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য মসলা।

মিঃ লকসলি বললেন, শোন, মিঃ বোস, এখানে হয়ত দু'তিন দিন আমাদের থাকতে হবে। চল, এর মধ্যে তোমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দিই।

আমি বললাম, এ তো আমার কাছে এক মস্ত সুযোগ। জাঞ্জিবারের কথা ভূগোলে কত পড়েছি। আজ তা নিজের চোখে দেখব, একথা কি কোনদিন ভেবেছিলাম?

ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলের কাছ থেকে অনুমতি কিন্তু তোমাকে আদায় করতে হবে। বললেন মিঃ লকসলি।

কেন ? কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম আমি।

এ সময়টায় আমাদের ঘাড়ের উপর দিয়ে কত বিপদ যাচ্ছে। তাই তিনি কি আমাকে ছাড়বেন ? তুমি নতুন লোক। জায়গাটা কোনদিন দেখ নি। তুমি চাইলে হয়ত অনুমতি মিলতে পারে।

মিঃ লকসলির অনুমানই ঠিক। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল তো আমার কথা শুনে হেসেই অস্থির। বললেন, ছেলেমানুষ তুমি। তাই এই শখ। এই ভূতুড়ে দেশে কিছু আছে নাকি ? নোংরা লোকজন আর যাচ্ছেতাই সব চোর-ঠগ—

কিন্তু আমি তখন নাছোড়বান্দা। অগত্যা অনুমতি মিলল। তবে মাত্র ঘণ্টা চারেকের জন্য।

মিঃ লকসলি আমার জন্যে বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন। অনুমতি পাওয়ার কথা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন, বাবাঃ! বাঁচালে। ঐ জাহাজের একঘেঁয়ে তক্তা গুনতে গুনতে আর মেসিনের ঘসঘস আওয়াজে একেবারে পাগল হওয়ার মত অবস্থা। মাটিতে পা না দিলে মানুষ বাঁচে ?

মনে মনে হাসলাম। তা হলে দেখছি আমার শুধু নয়, মিঃ লকসলির নিজেরও ইচ্ছে শহরে ঘোরা।

অতএব মিঃ লকসলি এবং আমি হারবারে নামলাম। মিঃ লকসলি সঙ্গে নিলেন তাঁর প্রিয় মোটর সাইকেলটি। বললেন, তুমি বুঝবে না হে, এ হোল ধড়িবাজের দেশ। জাহাজের নাবিক পেয়েছে কি সকলেই জবাই করতে চায়। ট্যাক্সিওয়ালা কি কম ধুরন্ধর! তার চাইতে আমার এই ভাল। ঘোর যেখানে ইচ্ছে সেখানে।

আর সত্যিই আমরা তাই ঘুরলাম। ছোট্ট হাল ফ্যাসানের এই শহরটির সমস্ত চৌহদ্দি ঘুরতে আমাদের খুব বেশী সময় লাগল না। তারপর এক সময়ে মিঃ লকসলি আমাকে এনে তুললেন একটি

রেস্তোরায়—একেবারে আরব সাগরের পাশ বরাবর। সেখান থেকে পরিষ্কার আমরা দেখতে পেলাম আমাদের স্কুইরেলকে॥

তখন সবে বিকেলের শুরু। তাই বোধহয় রেস্তোঁরায় তেমন লোক ছিল না। ওয়েটার খাবার রাখলে আমরা তাতে মন দিলাম।

খেতে খেতে মিঃ লকসলি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন মনে হচ্ছে তোমার, বোস?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জবাব দিলাম, চমৎকার! ছোটকালে কতবার এর নাম শুনেছি। আজ দেখলাম এর বিচিত্র গাছপালা। আর কি লম্বাই না তারা!

নিরক্ষীয় অঞ্চলে অতিবৃষ্টির জন্যেই এমন হয়। জবাব দিলেন মিঃ লকসলি।

এমনি করে কথা বলতে বলতে বেশ আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। মনে হোল স্বদেশ থেকে কতদূরে কোন সে অচিন দেশে আজ আমি বসে রয়েছি। কিন্তু হঠাৎ বাধা পেতে হোল লকসলির ব্যবহারে।

মিঃ বোস! বলে হাত চেপে ধরলেন লকসলি। মুখটা একেবারে আমার কান বরাবর এনে বললেন, লক্ষ্য করেছ?

প্রথমটায় চমকে উঠলাম। এ আবার কি ব্যাপার?

আরে ঐ কাচের জানলার ভেতর দিয়ে দেখত, ঐ লোকটাকে তোমার অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না?

তাঁর নির্দেশ মত কাচের জানলার বাইরে চাইতেই দেখি, একটি মিশকালো লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। লম্বায় অন্তত ছয় ফুটের বেশী হবে। একটি টেলিক্যামেরা তাগ করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে মুখ করে। অদ্ভুত হিংস্র তার চেহারা। পরনে দামী স্যুট।

আপনার কি মনে হয়, আমাদের দিকেই ওর নিশানা? বললাম আমি।

কিন্তু কোন উত্তর না দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে আমার ঘাড় ধরে মিঃ লকসলি টেবিলের একপাশে গড়িয়ে পড়লেন। আর পর মুহূর্তেই দেখলাম আমরা যেখানে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছি ঠিক তারই পাশ বরাবর—হ্যাঁ, পরিষ্কার দেখলাম, একটি কাঠের টেবিলের পায়ায় গেঁথে রয়েছে একটা পিন—সাপের জিভের মত লাল পিন। ঈস! আর একটু হলেই তো সব শেষ হয়ে গিয়েছিল! আমার সমস্ত শরীর তখন রীতিমত ঠকঠক করে কাঁপছে।

রেস্তোঁরায় হুলস্থূল পড়ে গেল। ম্যানেজার ছুটে এসে বলল, এ সব কি কাণ্ড দেখছি?

কিন্তু বাহাদুর বলব মিঃ লকসলিকে। বিপদের মাঝখানেও তিনি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেন। কাল বিলম্ব না করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। তারপর ম্যানেজারের হাতে একটি গোটা নোট পুরে দিয়ে বললেন, থামুন, মশায়। এখন বাগড়া দেবেন না। বলেই ঝটকায় আমার হাত ধরে সোজা এসে উঠলেন তাঁর মোটর সাইকেলে। আমি তাঁর পেছনে বসলাম।

এ কি করছেন আপনি, মিঃ লকসলি?

থামো এখন। ব্যাটা শয়তানকে ধরতে হবে। বলে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন লকসলি।

কিন্তু কে সে? কোথায় সে?

বলি, তুমি কানা হলে, মিঃ বোস? সামনের ঐ ধূসর রঙের কারটা দেখছ না?

চকিতে দেখলাম একটি ধূসর রঙের মোটর গাড়ী একটি বাঁকের কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পেছনের কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলাম একটি মিশকালো মুখ। একপাটি সাদা দাঁতের ঝলসানি। উঃ। সে কি দারুণ! কি অসহ্য!

ততক্ষণ মিঃ লকসলির মোটর সাইকেল দুর্দান্ত গতিতে ছুটতে শুরু করেছে। দিগবিদিগ জ্ঞান তার হারিয়েছে। প্রথমে ছুটলাম বিচ বরাবর। তারপরই দ্রুত কয়েকটি বাঁকের পাশ দিয়ে কোন রকমে সামলালেন মিঃ লকসলি। প্রায় তিন তিনটে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলাম আমরা। তারপর বাঁক ঘুরে, একেবারে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সোজা রাস্তা। হ্যাঁ, দেখা গেছে সেই ধূসর রঙের কার। এবার আমাদের থেকে কয়েক ফার্লং দূরে। এবার আরও স্পিড বাড়ালেন মিঃ লকসলি। ক্রমেই কার এবং আমাদের মধ্যে দূরত্ব কমে আসতে লাগল। আবার একটি বাঁক। এখানে কোন ক্রমে সামলে নিলেন মিঃ লকসলি। কার ততক্ষণ আর একটি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। হায়, হায়! হাতের মুঠো থেকে সব বুঝি গেল! এবার একেবারে মরিয়া হয়ে ছুটল মোটর সাইকেল।

এমন সময় প্রচণ্ড একটি বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল। আর পর মুহূর্তেই একটা ঝোলান পুলের সামনে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে ব্রেক কষে মোটর সাইকেল দাঁড় করালেন মিঃ লকসলি। ঝাঁকুনির চোটে আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম একপাশে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে এলাম। মিঃ লকসলি সাইকেলটিকে একপাশে দাঁড় করিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। আমি সম্মুখে চাইতেই দেখি —হে ভগবান! একটুর জন্যে আমরা রক্ষা পেয়ে গেলাম। মিঃ লকসলি যদি আর এক মুহূর্ত দেরি করতেন, আমরা দুজনে প্রায় পাঁচশ' ফুট নিচে এক পার্বত্য গহ্বরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। পুলটিকে ডিনামাইট দিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে শত্রুপক্ষ।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, তা হলে এইমাত্র যে বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম সেটা এরই ?

বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন মিঃ লকসলি, তা না হলে সেটা কি মনে কর তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্যে নহবতের তান ?

না, মানে বলছিলাম—

থাক। আর মানে করে কাজ নেই।

বেশ যে চটে গেছেন মিঃ লকসলি তা তাঁর কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল। উঃ! কি ধুরন্ধর শয়তান। এখানেও সে মৃত্যুফাঁদ পেতেছে ?

কিছুক্ষণ কাটল নীরবে। তারপর বলতে লাগলেন মিঃ লকসলি, আর—আর একটু আগে যদি ওকে দেখতে পেতাম ? কিন্তু ভাবছি, আমি যে এখানে আসব ওরা তা জানল কি করে ? অথবা—?

যেন চমকে উঠলেন তিনি।

কি ব্যাপার ?

না, মানে, আমাদের জাহাজ যে জাঞ্জিবারে নোঙর করেছে এ সংবাদ এর মধ্যে ওরা কি করে সংগ্রহ করেছে ?

আসল ব্যাপারটা তা হলে কি দাঁড়াল ? আমার প্রশ্ন।

শত্রুপক্ষ আমাদের পিছু নিয়েছে। ভাগ্যিস আমি তোমার পেছনের গ্লাস-প্যানটার দিকে তাকিয়েছিলাম। তুমি তো দিব্যি খাচ্ছিলে। গ্লাস-প্যানের উপর দেখলাম সেই শয়তানটার চেহারা। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তোমার দিকে একটা ক্যামেরা তাগ করে আছে। তারপরই তোমাকে দেখালাম ওকে। যাক। তাড়াতাড়ি সেই রেস্তোঁরায় যেতে হচ্ছে। দেখি, সেখানে আবার কি ব্যাপার ?

কিন্তু সেখানে এসে আর এক কাণ্ড! পুলিশে সমস্ত রেস্তোঁরা বোঝাই। ম্যানেজার খুন হয়েছে। কে বা কারা খুব সাধারণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ গলা টিপে তাকে হত্যা করে গেছে। লাল পিনটি, যেটা চেয়ারের পায়ায় গেঁথে ছিল সেটাও পাওয়া গেল না।

আমরা সেখানে যেতেই জনৈক পুলিশ অফিসারকে দেখিয়ে একজন

ওয়েটার বলল, আজ্ঞা, এঁরা। এঁদের উপরই ঐ পিন তাগ করা হয়। তারপর ম্যানেজারের হাতে একটি নোট গুজে দিয়ে, কোথায় যেন উধাও হলেন এঁরা। তারপরই দুইজন নিগ্রো এসে হুজুরকে গলা টিপে মারে এবং চেয়ারের পায়া থেকে পিনটি নিয়ে চম্পট দেয়।

মিঃ লকসলি প্রতিবাদের সুরে বললেন, অফিসার, পিনটি আমাদের উপর তাগ করা হয়েছিল। এ ছাড়া আমরা কিছুই জানি না।

অফিসার বলল, মাপ করবেন মশায়। আপাতত আপনার বক্তব্য হেডকোয়ার্টার্সে কমিশনার মিঃ এনভিলের কাছেই বলবেন। এখন আমার সঙ্গে সেখানেই অনুগ্রহ করে আপনারা আসুন।

এর পর প্রতিবাদ করা বৃথা। বুঝলাম রেস্তোঁরার ম্যানেজার খুন না হলে ব্যাপারটা এরকম জটিল আকার নিত না। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! কোথায় অচিন দেশে এসে মৌজ করে এদিক সেদিক ঘুরছিলাম, তারপর এ কি ফ্যাসাদ? আমরা গিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠলাম। পুলিশ অফিসার পদে একজন সাব-ইনসপেকটর। নিজের নাম বললেন, মিঃ সাবেরি।

পথে মিঃ সাবেরি মিঃ লকসলিকে বলল, আপনারা বিদেশী। ব্যাপারটা খুবই অপ্রীতিকর হোল। কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় আমাদের ছিল, বলুন?

মিঃ লকসলি যে খুবই চিন্তিত তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। তবু বিদেশী এই অফিসারের কথার উত্তরে বললেন, আপনার আর দোষ কি, আপনি কর্তব্য পালন করেছেন।

মিঃ সাবেরি বলল, মাত্র কয়েক মিনিট আগে আমাদের এই পেট্রোল ভ্যানটি একরকম হঠাৎই এসে পড়ে ঐ রেস্তোরাটার সামনে। ম্যানেজার ততক্ষণ খুন হয়ে গেছে। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ নিগ্রো দুটিকে আমরা ধরতে পারি নি। আচ্ছা মশায়, পিন, পিন বলে ওরা কি

সব বলছিল ? মানে হোটেলের লোকদের কথায় যদিও আমরা আপনাদের অ্যারেস্ট করেছি, তবু সমস্ত কিছুই আমার কাছে কেমন যেন আজগুবি বলেই মনে হচ্ছে।

মিঃ লকসলি বললেন, এখন কোন কিছুই আপনাকে আমরা বলব না, মিঃ সাবেরি। সময়মত সব কিছু আপনি জানতে পারবেন। তবে একটা অনুরোধ করব, অনুগ্রহ করে আজকের এই ঘটনা যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয় সে ব্যাপারে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন। আপাতত একটি কথা শুধু জেনে রাখুন, একটি প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্র আজ সারা পৃথিবী জুড়ে দানা বেঁধে উঠছে। আর তার স্বরূপ উদ্ঘাটন কেউ যদি করতে পারে তা হলে তা পারবে স্কুইরেলের নাবিকরা।

স্কুইরেল ?

মানে আমাদের জাহাজ স্কুইরেলের কথা বলছি। রেস্তোঁরায় আমাদের কোন কথাই আপনি শুনতে রাজী হন নি। তাই নিজেদের পরিচয় দেওয়াও তখন সম্ভব হয় নি।

গতকাল রাত্রে ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল যে কারগো জাহাজটি নোঙর করেছেন, আপনি কি তারই কথা বলছেন ?

আমি মিঃ লকসলি, সেই জাহাজটিরই সহকারী ক্যাপ্টেন। আর ইনি মিঃ বোস, রেডিও অফিসার।

মিঃ লকসলি আমারও পরিচয় দিলেন।

লকসলির উত্তরে সাবেরি যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল। সজোরে সে লকসলির দুখানা হাত জড়িয়ে ধরে বলল, মাফ করবেন, মিঃ লকসলি। আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না বলেই এমন একটা দুর্ঘটনার সম্মুখে পড়েছি। আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। স্কুইরেলের কিছু কিছু ব্যাপার আমরাও জানি। আপনাদেরকে সাহায্য

করার জন্যে সরকার থেকে আমাদের উপর বিশেষ উপদেশ দেওয়া আছে। মানে মিঃ ব্রিকহিল আমাদের কাছে যা যা সাহায্য চান আমাদের তা দিতে হবে।

ইতিমধ্যে পেট্রোল ভ্যান এসে উপস্থিত হোল হেডকোয়ার্টার্সে। মিঃ সাবেরির সঙ্গে আমরা উপস্থিত হলাম মিঃ এনভিলের কক্ষে। ভদ্রলোকের বয়েস বছর পঞ্চাশেক হবে। লম্বা, বেশ তীক্ষ্ণ চেহারা। বাবা-মা আমেরিকান। নিজে এখানকারই নাগরিক।

মিঃ সাবেরি পরিচয় করিয়ে দিলে মিঃ এনভিল যেন মুহূর্তের মধ্যে কতকটা হতবাক হয়ে পড়লেন। যেন ভূত দেখতে পেয়েছেন এমন ভাবে বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ লকসলির দিকে চেয়ে বললেন, এখনও আপনারা বেঁচে আছেন, মশায়? মানে, এখনও মরেন নি তা হলে? ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল তো ভেবেই সারা! আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে আপনাদের কোন খবর পাই নি।

মিঃ লকসলি নিজেকে সংযত রেখে রসিকতার সুরে বললেন, তেমন কি কোন কথা ছিল?

কোন উত্তর না দিয়ে মিঃ এনভিল আমাদের নিয়ে এলেন হাজত-ঘরে। উজ্জ্বল আলো জ্বাললেন। আর তারপরই—! উঃ সে এক ভীষণ দৃশ্য! একেবারে পৈশাচিক! মানুষের ইতিহাসে এমন জঘন্যতম ঘটনা ঘটে কিনা, আমাদের জানা নেই। সমস্ত হাজত উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ভরে রয়েছে। তারই মধ্যে দেখলাম দুটি নিগ্রো দুদিকে ছিটকে পড়ে আছে। তাদের মাথার খুলির টুকরো টুকরো অংশ সারা হাজত-ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে। থাক থাক রক্তের এবং ঘিলুর পিণ্ড ঘরময় ছড়ান। মনে হল কে যেন তাদের মাথা পাথর দিয়ে থেঁতলে সারা ঘরে ছড়িয়ে রেখে গেছে।

মিঃ লকসলির অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হোল, বীভৎস!

আমি বললাম, এ একেবারে অকল্পনীয় ব্যাপার।

বলুন, একেবারে সাংঘাতিক মশায়, একেবারে সাংঘাতিক। যোগ করলেন মিঃ এনভিল।

আমরা মিঃ এনভিলের ব্যক্তিগত কক্ষে এসে বসলে· মিঃ এনভিল সমস্ত ঘটনা বলতে শুরু করলেন : মিঃ লকসলি এবং মিঃ বোস, আপনারা স্কুইরেল থেকে শহরে এলে ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল বেতারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি বলেন, আপনারা শহরে ঘুরতে বেরিয়েছেন। আপনাদের উপর নজর রাখার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা কেউ আপনাদের চিনি না। তবু আমি সাব-ইনসপেকটর মিঃ সাবেরিকে পাঠাই একখানি পেট্রোল ভ্যান নিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করতে। যে রেস্তোঁরায় আপনারা উঠেছিলেন, সাধারণতঃ নতুন নাবিকরা ওখানেই ওঠেন। মিঃ সাবেরিকে আমি তাই ঐ রেস্তোঁরার উপরই বেশী নজর রাখতে বলি। ইতিমধ্যে মিনিট পঁয়ত্রিশেক আগে আমার আর একটি পেট্রোল পার্টি এই দুইজন নিগ্রোকে বন্দী করে আনে। ষণ্ডামার্কা এই নিগ্রো দুটি বহু চেষ্টা করে গা ঢাকা দেবার। এদের অপরাধ ছিল ট্র্যাফিক নিয়ম ভঙ্গ করা। শহরের বড় রাস্তা দিয়ে এরা অত্যন্ত জোরে গাড়ী চালাচ্ছিল এবং তার ফলে জন তিনেক লোকও খুন হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে এদের কোন পরিচয়ই আমরা বের করতে পারি নি। তবে মনে হোল এরা ব্রিটিশ গায়েনার নাগরিক। পাশের ক্যাবিনে এদেরকে আটক রাখার হুকুম দিয়ে আমি অন্য কাজে একটু বাইরের ঘরে এসেছি, এমন সময় আমার একজন সেপাই জর্জ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে জানাল, নিগ্রো দুটি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখলাম, ওরা দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দিই। সেপাইদের হুকুম দিই ওদের গারদে এনে

রাখতে। রাখাও হয়। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। প্রহরারত সেপাই এসে জানাল, সর্বনাশ হয়ে গেছে, স্যার। কয়েদীরা খুন হয়ে গেছে। এ আবার কি রগড়? বিশেষ করে যে কয়েদখানাটি একেবারে ভেতরে এবং খুবই সুরক্ষিত সেখানে বিস্ফোরণ কি করে হতে পারে? অন্তত বাইরে থেকে বোমা ফেলা খুবই অসম্ভব সেখানে। তা হলে কি ওদের সঙ্গেই বোমা ছিল? তাই বা কি করে সম্ভব? গারদে পোরার সময় তো তল্লাসিও করা হয়েছিল ওদের?

ডাক্তার এলেন। আমরা দুজন আসামীকে দেখতে গেলাম। আর চমকে উঠলাম ভীষণভাবে। কী বীভৎস কাণ্ড!

ডাক্তার খুলি পরীক্ষা করে জানালেন, ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। বিস্ফোরণের কায়দাটা কেমন যেন। লোক দুটির গলা থেকে নীচ অবধি কিছুই হয় নি। অথচ সমস্ত মুণ্ডটি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ধড়ের সঙ্গে যেটুকু অংশ লেগে ছিল তার মধ্যে রূপোর মত ধাতু দিয়ে তৈরি ছোট্ট দুটি ক্যাপসুল পাওয়া গেছে, তবে ফাটা। কিন্তু এ দুটি তাদের খুলির মধ্যে আসে কি করে?

একটু থামলেন মিঃ এনভিল।

আমরা দুজনেই অভিভূতের মত সমস্ত কিছু শুনছিলাম।

মিঃ সাবেরি বলল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্যার, এই দুই নিগ্রোই রেস্তোঁরার ম্যানেজারকে খুন করেছে। অনুগ্রহ করে আমাকে আর একবার ওদের দেহ তল্লাস করতে দিন। বলেই সাবেরি উঠে গেল এবং মাত্র তিন মিনিট পর ফিরে এসে জানাল, তার অনুমানই সত্য। এই সেই লাল পিন টেবিলের পায়ায় যেটা গাঁথা ছিল, যেটিকে ওরা সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসে। পিনটি একজনের ওয়েস্ট কোটের পকেটে পাওয়া গেল।

মিঃ লকসলি বললেন, মিঃ সাবেরির কথাই ঠিক, কমিশনার এনভিল।

এই পিনটিই তাগ করা হয় আমার ওপর। তিনি মিঃ এনভিলকে সমস্ত কথা বললেন। বললেন, কি ভাবে একজন লোক ক্যামেরা নিয়ে রেস্তোঁরায় তাঁদের ফটো তুলতে চেষ্টা করে। কি ভাবে লাল পিনটি তাঁদের উপর তাগ করা হয় এবং কিভাবে ভাঙ্গা সেতুর কাছ থেকে একটুর জন্য প্রাণ নিয়ে তাঁরা ফিরে আসেন।

সমস্ত শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন মিঃ এনভিল। পুলিশ জীবনে এমন অভিজ্ঞতার সুযোগ কোন দিনই তাঁর ঘটে নি। মিঃ লকসলিকে তিনি বললেন, আপাতত কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার অবশ্য আমার কাছে একটি কেবল পাঠিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন, ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলকে আমি যেন যথাযথ সাহায্য করি। কি সাহায্য করতে হবে, কি ভাবে করতে হবে, সে কথা অবশ্য এই কেবলে বলা হয় নি। আমি ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলকে এই কেবলের সংবাদও জানিয়েছি। তিনি আমাকে আগামী কাল একবার তাঁর জাহাজে যেতে অনুরোধ করছেন।

মিঃ এনভিলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পোর্ট পুলিশের লঞ্চে ফিরে এলাম জাহাজে। অপরাহ্নের বিলীয়মান সূর্যরশ্মি সমস্ত হারবারের আবহাওয়াকে কোন এক আলো-আঁধারির রহস্যে ঘিরে রেখেছিল। ঐ দূরে স্কুইরেল দেখা যায়। বিশ্বের সমস্ত ভীতি যেন ঐখানেই জমাট হয়ে রয়েছে। লঞ্চটি যতই এগিয়ে যেতে লাগল, ততই মনে হোল, আমরা এক ভীষণ দেশের দিকে এগিয়ে চলেছি। মৃত্যুর হাত থেকে কেউই আমাদের রেহাই দিতে পারবে না।

জাহাজে তো এলাম। ক্লান্ত, অবসন্ন। সারাদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা কেমন যেন করে ফেলেছিল আমাদের। ভাবলাম, বিশ্রাম নিলে

সমস্ত অবসাদ হয়ত দূর হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর বিধাতা আড়াল থেকে হাসেন। আবার দুঃসংবাদ।

মিঃ ব্রিকহিল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বললেন, এতক্ষণ তোমরা ছিলে কোথায়? উঃ! আমরা ভেবে ভেবে সারা। হাঁপাতে লাগলেন তিনি: এদিকে আর এক কাণ্ড। আমাদের একজন মেটকে কে বা কারা খুন করে গেছে! ব্যাচারা! মিঃ ব্রিকহিলের কণ্ঠস্বরে কম্পন।

খুন !!!

আমি কি তা হলে তোমাদের সঙ্গে রসিকতা করছি? ব্রিকহিল রেগে উঠলেন।

না,—মা—নে—! অপরাধীর কণ্ঠে লকসলি কথা বলার চেষ্টা করলেন একবার।

এর মধ্যে কোন মানেই নেই। ধমকের সুরে বলতে লাগলেন মিঃ ব্রিকহিল: তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ক্যাবিনে বসে বিশ্রাম করছিলাম। হয়ত আরব সাগরের জলহাওয়ার জন্য একটু ঘুমিয়েও থাকব। এমন সময় মিঃ স্মিথ এসে খবর দিল, আমাদের একজন মেট মিঃ হকিন্স হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে। প্রথমে তার কথায় আমি একটু বিরক্ত হয়ে উঠি। একজন মেট অজ্ঞান হয়েছে, এ আবার কি এমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যা ক্যাপ্টেনকে না দিলে চলে না? জাহাজের লস্কররা এমন তো হামেশাই হয়। তাই একটু রূঢ় কণ্ঠেই বলে উঠলাম, ডাক্তারের ক্যাবিনের পথটা কি ভুলে গেছ, মিঃ স্মিথ?

মিঃ স্মিথ বলল, ডেকের উপর হাকিন্স কাজ করছিল। এই সময় হঠাৎ সে ঢলে পড়ে যায় এবং জ্ঞান হারায়। ওর পায়ের গোড়ালিতে একটা লাল পিন পাওয়া গেছে।

আবার পিন? উঃ! ওর হাত থেকে কি আমাদের রেহায় নেই!

আর অপেক্ষা না করে ছুটলাম ডাক্তার স্ট্যানলির ক্যাবিনে।

সেখানে একটি টেবিলের ওপর হকিন্সের দেহ শায়িত। তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে কি যেন পরীক্ষা করছেন তিনি।

ব্যাপার কি, ডাক্তার? আশা করি কোন আশঙ্কার কারণ নেই!—বললাম আমি।

প্রবীণ ডাক্তার আস্তে আস্তে সরিয়ে নিলেন ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি চোখের ওপর থেকে। তারপর বললেন, আশা আছে। কিন্তু ভয়ঙ্কর বিষ। আমি ভাবছি, এর উৎস কোথায় থাকতে পারে?

ওকে আপনাকে বাঁচাতেই হবে ডাক্তার? মিনতির কণ্ঠে বললেন ব্রিকহিল।

আমি চেষ্টা করছি। বললেন ডাক্তার স্ট্যানলি।

আর সেই দিনই রাত এগারটায় বেতারে সংবাদ পাঠালেন কমিশনার এনভিল। তাতে বলা হোল: যে নিগ্রো দুটি কয়েদখানায় মারা গেছে, ওদের মাথার মধ্যে বিভিন্ন রকমের দুটি যন্ত্র পাওয়া গেছে। পারমাণবিক যন্ত্র। মনে হয়, মৃত্যুর জন্য ওরা নিজেরা কেউ দায়ী নয়। আসলে ওরা খুনই হয়েছে। বিস্তারিত খবর আগামী কাল জানা যাবে। পোর্ট পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে স্কুইরেলকে পাহারা দিতে। মিঃ ব্রিকহিল, আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনাদের সমস্ত নাবিক আজ যেন সজাগ থাকে। আমরা আশঙ্কা করছি, নতুন একটি দুর্ঘটনা আজও ঘটতে পারে। অতএব সাবধান!!

সমস্ত কিছুই যেন গুলিয়ে যাবে। এ পর্যন্ত যে সব পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম—সবই ব্যর্থ হতে চলেছে। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল বললেন, থাক মশায়রা। ও ব্যাপারটি নিয়ে আমরা যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছি। আর বারবার এইটেই প্রতিপন্ন হয়েছে, আমরা সেই কালরূপ বিজ্ঞানীর কাছে আকাট মূর্খ—গবেট।

রাত সাড়ে এগারটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে আমরা স্কুইরেলের পদস্থ অফিসাররা আজকের রাতটা কি ভাবে কাটান যায়, তারই পরিকল্পনা করতে বসলাম। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলের মন্তব্যের বিরুদ্ধে কোন কথাই আমাদের মুখে এল না।

কিছুক্ষণ সারা ক্যাবিন জুড়ে শ্মশানের নীরবতা। ক্ষীণ একটি নীল আলোর রেখা বিশ্বের সমস্ত রহস্য যেন ঘিরে রেখেছে সকলেরই মুখে। এমনি করে কাটল অন্তত দশ মিনিট। তারপর কথা বলতে লাগলেন ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল ঃ আজকের রাত আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেবে, এ খবরের কথা আপনাদের বলেছি। সেই মত আমাদের জাহাজের সমস্ত সিনিয়ার এবং জুনিয়ার অফিসার থেকে সাধারণ লস্করকে পর্যন্ত—কাকে কোথায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হবে সে নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে। কি ভাবে যে আমরা বিপদের সম্মুখীন হব, সেটা অবশ্য অনুমান করা শক্ত। তবে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, এ বিষয়ে সকলেই আপনারা নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন।

এমন সময় ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনের রেডিও ফোন শব্দ করে উঠল। ওয়ারলেস ক্যাবিন থেকে সহকারী অপারেটার মিঃ স্টিফেন বলল, হারবার থেকে কমিশনার এনভিল আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তাঁর সংকেত সবুজ বাতি। তিনবার জ্বলেই নিভে যাবে। তারপর এক মিনিট অন্তর তিনবার জ্বলতে থাকবে।

ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, ও. কে.।

প্রায় সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে চলে গেলেন। আর তার এক মিনিট পরই সমস্ত জাহাজ আলোয় আলোকিত করে দেওয়া হোল। বড় বড় ফ্লাড লাইটের তীব্র রশ্মি বিচরণ করতে লাগল আরব সাগরের বুকে—কখনও বা আকাশে। মাল্লারা

তৎপরতার সঙ্গে শ্যেন চক্ষু মেলে অপেক্ষা করতে লাগল অজানিত বিপদের অপেক্ষায়।

মিঃ লকসলি, ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল এবং আমি রুদ্ধশ্বাসে উপকূলের দিকে চেয়ে রইলাম। মাত্র দু মিনিট। কমিশনার এনভিলের সংকেত-আলোক জ্বলে উঠল তিনবার। ঘড়ি দেখলাম আমি। হাঁ, এক মিনিটই। আবার জ্বলে উঠল সেই আলো। তারপর ক্রমান্বয়ে জ্বলতে নিভতে এগিয়ে আসতে লাগল জাহাজের দিকে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই এনভিল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে। উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়বেন তিনি।

হাউ ডু ইউ ডু?—হাত বাড়িযে দিলেন ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল।

হাউ ডু ইউ ডু?—করমর্দন করলেন এনভিল আমাদের সঙ্গে।

আপনার এখানে পানীয়র ব্যবস্থা কেমন আছে, সে কথা আগে বলুন, ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল! মানে—মাফ করবেন। এমন একটি ব্যাপারের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি—বাপের জন্মে এসব কথা কোন দিন মাথায় ঢোকে নি আমার। গলা শুকিয়ে আসছে।

আমি এক বোতল ভাল মদ এবং সোডা রাখলাম এনভিলের সম্মুখে। এক নিঃশ্বাসে প্রায় আধবোতল মদ সাবাড় করে একটু দম নিলেন এনভিল। তারপর শুরু করলেনঃ আপনাদের মধ্যে মিঃ বোসের প্রতিই শত্রুপক্ষের নজর একটু বেশী পড়েছে।

তার মানে? চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল।

ব্যাপারটা তা হলে শুনুন। যে দুজন নিগ্রো আজ হাজতে নিহত হয়েছে—কেন এবং কি ভাবে অমন সুরক্ষিত স্থানে তারা নিহত হয়েছে সে খবর কি আপনারা রাখেন? বিশেষ করে অমন বীভৎস মৃত্যু! ব্যাপারটা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। তবু কি জানি কেন, আমার সন্দেহ হয়েছিল, হয়ত শত্রুপক্ষ মৃতদেহ দুটি লোপাট করবে।

অন্ততঃ করার চেষ্টা করবে। এই কারণে থানার চার দিকে আমি পুলিশ পাহারা বসালাম।

আর সত্যিই অপ্রত্যাশিত ভাবে এল এক নতুন খবর।

তখন সন্ধ্যে ছয়টা। বিশ্রামের আয়োজন করছিলাম, এমন সময় এই শহরের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ কাসাবুর টেলিফোন কল এল। ফোনে অনুরোধ জানিয়েছেন, অত্যন্ত জরুরী কারণে এখনই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রথমে একটু অবাকই হলাম। কিন্তু তাঁকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। ঠিক ছ'টা পনেরয় তিনি এলেন আমার বৈঠকখানায়। ওঁকে বেশ বিচলিত বলে মনে হোল।

ডঃ কাসাবু অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে বললেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, শুধু আমারই জন্যে আজ আমার দুইটি প্রিয়তম ছাত্রের মৃত্যু ঘটে গেল।

একি বলছেন, ডঃ কাসাবু?

ষাট বৎসরের বৃদ্ধ বিশ্ববরেণ্য এই আফ্রিকান বিজ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে আজ কেনা জানে! জাঞ্জিবারের এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও আজ তিনি জগদ্বিখ্যাত। সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তির উপর বেতার-তরঙ্গের একটি জটিল পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে রীতিমত পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরূপে পরিগণিত হয়েছেন তিনি।

ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন ডঃ কাসাবু, আমার নিজের কোনই দোষ ছিল না মিঃ এনভিল। বিগত দশ বৎসর গবেষণার ফল আমার রেডিও-এস-গ্রাফ যন্ত্র। এই বেতার যন্ত্রটির প্রভাব মানুষের মস্তিষ্কের ওপর ভীষণ ভাবে কাজ করে। অত্যন্ত জটিল এক ধরনের অপারেশন করে মানুষের মাথার খুলির মধ্যে এটিকে রাখতে হয়। তখন দেহের বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র এর অধীন হয়ে পড়ে—আমার এই আবিষ্কারের সংবাদ আপনারা সকলেই হয়ত রাখেন।

দিন দশেক আগে মাদাগাস্কার থেকে একটি কেবল পাই আমি। বলে যেতে লাগলেন ডঃ কাসাবু। এই কেবলে জনৈক ব্যক্তি কতকটা অযাচিত ভাবে আমার এই আবিষ্কারের জন্যে ধন্যবাদ জানায়। নিজের পরিচয় গোপন রেখে সে বলে, সে একজন এ্যানাটোমিস্ট। দীর্ঘকাল ধরে কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে মস্তিষ্ককে চালনা করা যায় তা নিয়ে সেও গবেষণা চালাচ্ছে। সম্প্রতি সে দুটি স্যাম্পেল যোগাড় করেছে। লোক দুটি নিগ্রো। স্বেচ্ছায় এই পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে তারা প্রস্তুত। আমি যদি চাই সে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।

ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলেন ডঃ কাসাবু। ভগ্ন কণ্ঠে বলতে লাগলেন তিনি, প্লিজ! ভুল বুঝবেন না আমাকে মিঃ এনভিল। বিজ্ঞান সাধনার নেশা আমাকে যেন পাগল করে তুলল। লোকটির কথায় আমি রাজী হলাম। মাত্র পাঁচদিন আগে সে আমার সঙ্গে দেখা করে। প্রথম পরিচয়েই বুঝলাম লোকটির বুদ্ধি প্রখর। একজন মস্ত বিজ্ঞানীও বটে। সে আমাকে এই জাঞ্জিবারেরই একটি গোপন জায়গায় নিয়ে যায়। যে দুজন নিগ্রো আজ নিহত হয়েছে, তারাও সেখানে উপস্থিত ছিল। সহকারী রূপে আমার ছাত্র বন্ধু নেগি আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। পরে শুনেছি নিগ্রো দুটি অর্থের প্রলোভনে রাজী হয়েছিল। তারা যে কি দারুণ ঝক্কি নিতে চলেছে সে কথা আদৌ জানত না।

দুজন সার্জেন নিগ্রো দুটির ব্রেন অপারেশন করে এবং আমার আবিষ্কৃত রেডিও-এস-গ্রাফ যথাস্থানে বসিয়ে দেয়। এই যন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হোল, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে দূর থেকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাকে নষ্ট করে দেওয়া যায়।

ফলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল, এই দুজন নিগ্রোর নিজে থেকে চিন্তা করার আর কিছুই রইল না। এদের পরিচালনা করার যন্ত্র রইল সেই লোকটির হাতে। আমার কাছে রইল শুধু রিপোর্টিং মেশিন।

আমার যন্ত্র কতটা কাজ করছে তার সমস্ত আমি জানতে লাগলাম এই যন্ত্রের সাহায্যে।

কিন্তু নিগ্রো দুটিকে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছে সেই লোকটি। এরা সে নির্দেশ পালন করেছে। এমন কি এই নিগ্রোরা তার নির্দেশ মত কখন কোথায় গেছে, কি চিন্তা করেছে—সমস্তই মস্তিষ্কের ভিতরে রাখা যন্ত্রের দ্বারা প্রেরিত বেতার তরঙ্গের সাহায্যে এরা জানতে পেরেছে। আর—। আর কি বলব আপনাকে মিঃ এনভিল। অসহায়ের মত আমি শুধু রিপোর্টার যন্ত্রের সাহায্যে দেখে গেছি কি দারুণ কাজেই না তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। আইনের ভয়ে তখনকার মত কিছুই প্রকাশ করতে পারি নি। দুজন বিদেশীকে হত্যা করার কাজে তাদের লাগান হয়েছে, এ সংবাদ আমি জানি! পুলিশ তাদের হাজতে পুরেছে তাও রিপোর্টার আমাকে জানিয়েছে। আর ধরা পড়ার পর পাছে সমস্ত গোপন তথ্য কেউ জানতে পারে তাই বেতার তরঙ্গের সাহায্যে এই যন্ত্রে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই দুজনকে যে হত্যা করা হয় কিছুক্ষণ পূর্বে সে খবরও পেলাম।—ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন ডঃ কাসাবু।

বলেন কি ডঃ কাসাবু? এমনও কি সম্ভব?—বিস্ময়ে ফেটে পড়লাম আমি।

তার থেকেও ভয়ঙ্কর শক্ত কিছু ঘটবে আজ স্কুইরেলে। সম্ভবত ওরা আজ স্কুইরেলের উপর হামলা চালাবে রাত্রে। মিঃ বোস এবং মিঃ লকসলির উপর ওদের এখন নজর। ব্যাপারটা কি ভাবে আমি জেনেছি, সে কথা না-ই বা জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ এনভিল। আপাতত এর চাইতে বেশী কিছু শুনতে চেষ্টা করলে আমাকে আপনারা বাঁচাতে পারবেন না। শুধু একজন—সেই পিশাচ বিজ্ঞানী ডঃ পিয়ার্সন। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি জগতের শাসনদণ্ড কেমন ধীরে ধীরে তার

হাতে চলে যেতে বসেছে। প্লিজ, আমি এখন ফিরে যাব। তবে তার আগে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে যাব আপনাকে। হয়ত এ দিয়েই স্কুইরেলকে বাঁচাতে পারবেন আপনি।

আমার করণীয়গুলি বলে গেছেন ডঃ কাসাবু। তারপর করুণভাবে চেয়ে আমার কক্ষ ত্যাগ করেছেন। যাওয়ার সময় তাঁর শেষ কথা ছিল, আমার জীবন বিপন্ন, মিঃ এনভিল।

আপনাকে কি পাহারা দেবার ব্যবস্থা করব ?

কোনই ফল হবে না।

মিঃ এনভিল থামলেন। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলাম। কিন্তু ঝানু পুলিশ অফিসার এনভিলের মেজাজ যথেষ্ট শক্ত। তিনি বললেন, যা যা করতে হবে ঠিক করে নিন। তারপর দেখা যাক। অবশেষে প্রতীক্ষা!

রাত বারোটা বেজে চল্লিশ। এনভিল এবং আমরা তিনজন সমস্ত জাহাজের আনাচে কানাচে ঘুরে এসে পাইলটের ক্যাবিনের উপর উপস্থিত হলাম। বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে এনভিল নির্দেশ দিলেন, জাহাজের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিন।

তাঁর নির্দেশ পালন করা হোল। মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক অন্ধকারে গেল ঢেকে।

মিঃ এনভিল আমাকে এবং মিঃ লকসলিকে নির্দেশ দিলেন মেসিন ঘরের চোর-কুঠরির মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে। তারপর পাইলট ক্যাবিনে শুধু তিনি এবং ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল দূরবীন চোখে চাইতে লাগলেন চারদিকে সমুদ্রের উপর! মাঝে মাঝে হাতের তীব্র সিগন্যালিং টর্চ জেলে নির্দেশ দিতে লাগলেন অদূরে প্রহরারত জলপুলিশদেরকে। প্রতিটি মুহূর্তে যেন কত যুগ।

বাজল একটা। একটা বেজে পঞ্চাশ। ঠিক দু'টো। বহু দূরে এনভিলের দূরবীনে ভেসে উঠল একটি ক্ষীণ বেগুনী আলো। যেন বেশ জোরে ভেসে আসছে স্কুইরেলের কাছাকাছি। লাউড স্পিকারের সাহায্যে এনভিল ঘোষণা করলেন: আমি এনভিল বলছি, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। বিপদের চিহ্ন দেখা গেছে।

আবার নীরবতা।

দুটো তিন। আলোটি জাহাজের কাছ থেকে মাত্র দুই ফার্লং দূরে এসে জলের উপর ভাসতে লাগল। মিঃ এনভিল এবার রেডিও ফোনে কান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংকেত-আলো জ্বলে উঠল।

এনভিল কথা বলতে লাগলেন: ইউনিট এক, ইউনিট দুই এবং ইউনিট তিন। তোমরা তোমাদের স্থান থেকে সোজা এগিয়ে এসো দু ফার্লং করে। ইয়েস! হ্যাঁ! লঞ্চের মোটর চালাবে না। দাঁড় টেনে এসো। —ইয়েস! —হ্যাঁ সামনের ঐ বাতি—কুইক্! গুলি করে বাতিটা ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা কর! হারি আপ, মেন!!

হঠাৎ রেডিও ফোনে একটি প্রচণ্ড ঘরঘর শব্দ হতে লাগল। আর তারই মাঝ থেকে ভেসে এল অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর: কমিশনার এনভিল, আমি ডঃ পিয়ার্সন বলছি। ডঃ কাসাবু জীবন দিয়ে তার শাস্তি পেয়েছে। আমার হাত থেকে স্কুইরেল কখনও রক্ষা পাবে না। কোন ক্ষতি তোমাদের আমি করতে চাই না। লরাকেও আমরা ফিরিয়ে দেব। শুধু লকসলির কাছে আমার যে ম্যাপটি রয়েছে তা ফেরৎ চাই।

রাগে কাঁপতে লাগলেন মিঃ এনভিল। ব্রিকহিল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়েছেন। এনভিল চীৎকার করে জল পুলিশদের হুকুম দিলেন, ফায়ার! ইউ মেন, ফায়ার!

গুড়ুম! গুড়ুম! অন্তত বারোটি রাইফেল গর্জে উঠল। বেগুনী

আলো অদৃশ্য হোল। আর পরক্ষণেই একটা প্রচণ্ড, বিকট এবং অদ্ভুত শব্দ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে যেন তোলপাড় করে তুলল। পরমুহূর্তে জাহাজের সমস্ত আলো উঠল জ্বলে। এনভিল আবার নির্দেশ দিলেন, জাহাজের সকলে শুয়ে পড়ুন।

যে যার নিজের জায়গায় চোখ বুজে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। প্রায় আধ ঘণ্টা চলল সেই প্রাণান্তকর শব্দ। কোত্থেকে যে শব্দ আসছে কেউ অনুমানই করতে পারল না।

শব্দ থামল। ভূমি থেকে তড়াক করে উঠে পড়লাম। বুকটা যেন এখনও ধুক-ধুক করছে। পাশে চাইলাম। কিন্তু এ কি? মিঃ লকসলি? মিঃ লকসলি কোথায়? তিনিও তো আমার পাশেই ছিলেন! রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এলাম ক্যাপ্টেন এবং এনভিলের কাছে। তন্নতন্ন করে জাহাজ খোঁজা হোল। কিন্তু মিঃ লকসলিকে আর পাওয়া গেল না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছোট সাবমেরিনটিও নেই।

নাবিক জীবনের অভিজ্ঞতা বহু বিচিত্র হয় শুনেছি। স্কুইরেলে কাজ করার সময় তা যে অনুভব করি নি সে কথাও বলব না। বিচিত্র সাগর, অসীম আকাশ, নীল জলের উপর মাছের সারি, তার সঙ্গে জাহাজের কলকব্জার কারসাজি—এ সমস্তই আমার কাছে অদ্ভুত বৈচিত্র্যের খোরাক বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু যে অভিজ্ঞতার প্রাণান্তকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তার কোন তুলনাই হয় না। কে এই নর-পিশাচ বৈজ্ঞানিক ডঃ পিয়ার্সন, যে এই সমুদ্রের মাঝে আমাদের সকলকে নাকানি-চুবোনি দিয়ে শেষ করছে—উঃ! কি খল! কি শয়তানী বুদ্ধি তার! যে বিজ্ঞানকে নিয়ে মানুষ একদিন চর্চা শুরু করেছিল নিজের দুঃখ দূর করতে, অপরের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি ভরে

দিতে—তাকেই ডঃ পিয়ার্সন ব্যবহার করছে নিজের স্বার্থ বজায়ের ব্যাপারে। মাথা যে গুলিয়ে যাবে এবার। শুধু আমার নয়—সকলের।

আমার কথা শুনে ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল যেন মূর্ছিতই হয়ে পড়লেন। একে সেই বিদঘুটে শব্দের রেশ সকলকে তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তারপর শত্রুপক্ষ ডঃ কাসাবু সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করেছে—সেটাও। অবশেষে মিঃ লকসলির অন্তর্ধান। হতভম্ব তো হওয়ারই কথা!

কিন্তু ঝানু কমিশনার বটে মিঃ এনভিল। বিপদের মাঝেও যে মাথা কি করে ঠাণ্ডা রাখতে হয়, তা তিনি জানেন। আমার কথা শোনার পর মুহূর্তের জন্যে একবার চাইলেন আমার দিকে। তারপর ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গেলেন মাইক্রোফোনের কাছে। জলপুলিশদের লক্ষ্য করে বললেন তিনি, মেন, আমি কমিশনার এনভিল বলছি। কোড—৩৪৮—৯৮—১। ইয়েস। ডঃ কাসাবুর ল্যাবোরেটারিতে একজন মেসেঞ্জার পাঠাও। তিনি কেমন আছেন সে খবরটা নিয়ে আমার অফিসে উপস্থিত হবে।

সাগরের বুক থেকে উত্তর ভেসে এল ঃ ইয়েস স্যার! বিল যাচ্ছে।

আমার দ্বিতীয় নির্দেশ, বলতে লাগলেন এনভিল, তোমরা সমস্ত জাহাজ ঘিরে ফেল। আমি জলের উপর আলো ফেলার ব্যবস্থা করছি। এই আলোয় যা কিছু দেখবে তাকে লক্ষ্য করে অন্তত ডজনখানিক গুলি করতে দ্বিধা করো না।

এর পরই মিঃ এনভিলের নির্দেশে জাহাজের মাস্তুলের উপর থেকে তীব্র ফ্লাড লাইট নিক্ষেপ করা হোল সাগরের বুকে। তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু হোল। তারই সঙ্গে চোখে দূরবীন কষে মিঃ এনভিলও চার দিকটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। কয়েক মিনিট। তারপরই কানে ভেসে এল টট্—টট্—টট্···। রাইফেলের একটানা শব্দ। দেখা

গেল প্রায় তিন ফার্লং দূরে কয়েকজন জলপুলিশ কি একটি জিনিস যেন জল থেকে লঞ্চে তুলল এবং লঞ্চটি এগিয়ে আসতে লাগল।

মিনিট পাঁচের মধ্যেই পুলিশ লঞ্চ এসে ভিড়ল স্কুইরেলের পাশে। সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হোল। দুজন পুলিশ বাক্সের মত একটি বস্তু নিয়ে উঠে এল জাহাজের উপর। আলোর সম্মুখে দেখলাম কালো রঙের এই বাক্সটি রাইফেলের গুলিতে প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। বাক্সের চারকোণে নিচের দিকে চারটে তামার ফাঁপা বল। সম্ভবত জলের উপর বাক্সটিকে ভাসিয়ে রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। মিঃ এনভিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাক্সটিকে দেখলেন।

আমি বললাম, কিছু অনুমান করা গেল কি, কমিশনার ?

কতকটা ব্যর্থতার দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে তিনি উত্তর দিলেন, মাফ করবেন, আমি তো বৈজ্ঞানিক নই। একমাত্র যিনি এর পরিচয় দিতে পারেন, তিনি ডঃ কাসাবু। তিনি যদি নিরাপদে থাকেন, একটা উত্তর তা হলে আমরা নিশ্চয় পাব।

তারপর ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলের দিকে চেয়ে বললেন, অত সহজে গুলিয়ে ফেললে চলবে না, ক্যাপ্টেন। খেলতে যখন নেমেছেন, তখন হাত-পা গুটিয়ে রাখলে চলবে কেন ? একটু চাঙা হয়ে নিন।

কাঁধের ফ্লাক্স থেকে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি এগিয়ে দিলেন তিনি ক্যাপ্টেনের দিকে। ক্যাপ্টেন এক চুমুকে তা নিঃশেষ করলেন। তারপর আর এক পাত্র নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, মিঃ বোস। ইয়ং ম্যান। আপনিও—

বললাম, আমার প্রয়োজন হবে না। আমি ঠিক আছি।

ওঃ। ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি বেঙ্গলী। তোমাদের আবার এতে সংস্কারে বাধে। ওয়েল ! ব্র্যাণ্ডির কাপে নিজেই চুমুক দিয়ে হেসে উঠলেন মিঃ এনভিল।

ব্র্যাণ্ডিপর্ব শেষ হলে মিঃ এনভিল আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন মেসিন-ঘরের চোর-কুঠরির মধ্যে। যন্ত্রচালিতের মত আমি এবং ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল তাঁকে অনুসরণ করলাম।

মেসিন-ঘরে প্রবেশ করে কমিশনার এনভিল চারদিকটা দেখে নিলেন। একবার ঝুঁকে পড়লেন দানবাকৃতি বড় ইঞ্জিনটির উপর। কি যেন ভাবলেন। তারপর এসে ঢুকলেন চোর-কুঠরির পাশে একটি হ্যাঙ্গারের কাছে। একটি ছোট্ট কালো রঙের কি যেন সেখানে ঝোলান ছিল। আমাদের নজরে তা পড়ে নি। কুঠরির উজ্জ্বল আলোর মধ্যে তিনি সেটি হাতে তুলে নিলেন। এবারে দেখলাম এটি একটি চারকোণা বাক্স। মিঃ এনভিল বাক্সটি আমাদের কানের কাছে ধরলেন। একটা গুন-গুন শব্দ তার ভেতর থেকে আমাদের কানে ভেসে এল।

বুঝলেন কিছু? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ এনভিল।

না। অবাক বিস্ময়ে আমরা দুজনেই উত্তর দিলাম।

মিঃ লকসলি কি নিরাপদেই আছেন বলে মনে হচ্ছে। অন্তত এখানে থাকা কালে তিনি শত্রুপক্ষের হাতে পড়েন নি।

বলেন কি, মিঃ এনভিল? এবারে অবাক হয়েই প্রশ্ন করতে হোল।—এ আপনি কি করে ভাবতে পারেন?

মনে রাখবেন মিঃ বোস, শত্রুপক্ষ যদি এই কুঠরিতে আজ আসত তা হলে এই যন্ত্রটি থেমে যেত, অর্থাৎ এই গুন গুন শব্দ শুনতে পেতেন না। জাহাজে এসে প্রথম যখন আমি এই চোর-কুঠরিতে প্রবেশ করি আপনাদের অলক্ষ্যেই এটিকে আমি এখানে রেখে যাই। ডঃ কাসাবু সেই নির্দেশেই আমাকে দিয়েছিলেন। যন্ত্রটি ডঃ কাসাবুর আবিষ্কার। এক ধরনের ক্যামেরা এটি। ব্যাপারটা তখন আপনারা লক্ষ্য করেন নি।

এ যে তাজ্জব ব্যাপার, মিঃ এনভিল! কথা বললেন মিঃ ব্রিকহিল—

শত্রুপক্ষ এলে যন্ত্রটি থামবে, কোন শব্দ করবে না। অথচ অন্য কেউ এলে যেমন চলছিল তেমনই চলবে, এও কি সম্ভব ?

কথা বলতে বলতে এরই মধ্যে বাক্সটিকে খুলে ফেলেছিলেন মিঃ এনভিল। চকিতে তার মধ্যে থেকে বের করলেন একটি সাদা কাগজ। কাগজের উপর পরিষ্কার ফুটে রয়েছে—হ্যাঁ সেই—সেই মূর্তি ! সেই ভয়ঙ্কর কালো মুখোশে সমস্ত শরীর ঢাকা। মাথায় আলোর বাল্ব। কাঁপতে লাগলেন ব্রিকহিল। চোখে মুখে তাঁর মুহূর্তের মধ্যে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছাপ। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন তিনি, দেখ— দেখ, মিঃ বোস। এই সেই মূর্তি। প্রাণঘাতী সেই দ্বীপে একদিন যাদের দেখেছিল আমার লোকেরা। তা হলে ? তা হলে এখানেও কি ওদের আগমন হয়েছে ? এখনও কি আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন মিঃ এনভিল যে, মিঃ লকসলি তাদের হাতে পড়ে নি ?

না। পড়েন নি। পড়লে এখানে তাঁর ছবি দেখতাম। আর তাঁর ছবি এর মধ্যে উঠলে এই যন্ত্রটিও আর গুন গুন শব্দ করত না। কে এই মুখোশধারী, সে কথা ডঃ কাসাবু বলেন নি। বলার সময়ও পান নি। এই যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য হোল যাকে লক্ষ্য করে এর ছবি তোলার কথা একমাত্র সে ছাড়া আর কারুর ছবি এতে উঠলে এর মধ্যেকার ঐ শব্দ থেমে যাবে।

তবে কি ? কি যেন বলার চেষ্টা করলেন ব্রিকহিল।

দাঁড়ান। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে এনভিল বললেন, আগে চলুন, যেখানে আপনাদের সাবমেরিনটি থাকত সে জায়গাটি আগে দেখে নেওয়া যাক। এই ক্যামেরার কথা পরে বলা যাবে।

জাহাজটির খোলের এক পাশে এলাম আমরা। এখানে একটি বিশেষ ধরনের গর্তের মত স্থানে সাবমেরিনটি ছিল। এখন সেখানটা ফাঁকা। মিঃ ব্রিকহিল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সাবমেরিনটি লকসলিই

ব্যবহার করতেন ! গভীর সমুদ্রের নিচেকার অবস্থা লক্ষ্য করা অথবা মাঝে মাঝে ডঃ হে-কে নিয়ে সমুদ্রের নিচের গাছপালা পরীক্ষা করা— এই ছিল ইদানীং লকসলির কাজ।

ডঃ হে ? প্রশ্ন করলেন এনভিল।

আমেরিকান। ভদ্রলোক বৈজ্ঞানিক। অনেকদিন ধরেই তিনি আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেছেন। ইদানীং অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতার জাহাজ ভেড়ার পরই প্লেনে বাড়ী ফিরেছেন।

এখন তিনি কোথায় ?

জ্যাকসনভিলে।

এমন সময় আমার পায়ের কাছে একটুকরো কাগজ দেখতে পেলাম। তুলে নিয়ে পড়তেই দেখি ব্রিকহিলকে লক্ষ্য করে মিঃ লকসলি লিখেছেন ঃ ক্যাপ্টেন, ওদের একজনকে দেখেছি। তারই পেছনে ধাওয়া করলাম। শেষটা আমাকে দেখতেই হবে। এটা একটি সুযোগ। ভয় পাবেন না। আধঘণ্টা পর সামান্য কিছু সংবাদ দেবার চেষ্টা করব।—আপনার অনুগত লকসলি।

সে কি ? এবার দারুণ চমক। লকসলি দারুণ বেপরোয়া, সে কথা আগেই জেনেছিলাম। কিন্তু এ যে ইচ্ছে করে মরণ-ফাঁদে পা দেওয়া ! চোর-কুঠরিতে আমরা তো একসঙ্গেই ছিলাম। তা হলে কখন সরে পড়লেন তিনি ? আমি কি তখন মরে ছিলাম ?

ঘড়ি দেখলাম। আধঘণ্টার আর মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি। আর দেরি না করে ছুটতে ছুটতে এলাম অয়ারলেস রুমে। রিসিভার প্রস্তুত করতে দুমিনিট গেল। আর ঠিক তার পাঁচ মিনিট পর ডায়েলে লালবাতি জ্বলে উঠল। ভেসে এল লকসলির সাংকেতিক বার্তা ঃ মিঃ বোস ! আমি ভাল আছি। এরই মধ্যে প্রায় পাঁচ মাইল এগিয়ে গেছি। শত্রুপক্ষ আমার সম্মুখে। প্রায় সিকি মাইল দূরত্ব

বজায় রেখে চলেছি।—ইয়েস! পরবর্তী সংকেত ৪৪৪-৫৬৮—০০০। থেমে গেল লকসলির বার্তা।

সমস্ত যেন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। কমিশনার এনভিলও বেশ যে ঘাবড়ে গেছেন বোঝা গেল। আসলে লকসলির এই অভিযান সমস্ত পরিস্থিতিকে একেবারে উলটে দিয়ে গেছে।

আর ঠিক তার পরমুহূর্তেই ওপার থেকে আলোর সংকেত এল এনভিলের কাছে: মৃত্যু! ডঃ কাসাবু বেঁচে নেই।

মিঃ এনভিল সংকেতে জিজ্ঞাসা করলেন, ডেড বডি কোথায়?

জবাব এল: ল্যাবোরেটারি থেকে থানায় আনা হয়েছে। মনে হয় শক্ খেয়ে মারা গেছেন তিনি।

মিঃ এনভিলকে বললাম, ব্যাপার কি, কমিশনার? সেই বিকট শব্দ। মিঃ লকসলির অন্তর্ধান। ডঃ কাসাবুর মৃত্যু। এবার সত্যিই কি আমরা পাগল হয়ে যাব?

না। এনভিল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, কিসের ঐ শব্দ, সেকথা আপনাদের আমি বলব না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, মিঃ লকসলি নিরাপদে এগোন। ডঃ কাসাবুর সঠিক পরিচয় না হয় পরেই শুনবেন। আপাতত আমার নির্দেশ্ রইল, যে মুহূর্তে আমার সংকেত পাবেন, আপনারা বন্দর ত্যাগ করবেন। জাঞ্জিবার আর আপনাদের কাছে নিরাপদ স্থান নয়। আমরা চাই না আপনাদের আরও একটি মূল্যবান জীবন নষ্ট হোক।

হঠাৎ মনে পড়ল সেই বাক্সটার কথা, সমুদ্র থেকে তুলে যেটাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে পাঠান হয়েছে। তাই কৌতূহল চাপতে না পেরে বললাম, সেই বাক্সটির ব্যাপারটা কি জানা সম্ভব নয়, কমিশনার?

এখন না। শুধু জেনে রাখুন, ওরই মধ্যে আজ ছিল স্কুইয়েলের সমস্ত

নাবিকের মৃত্যুবাণ। কি ওটা, কি ভাবে ওটা আপনাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারত সে কথা এখন আপনাদের আমি বলব না।

আর দাঁড়ালেন না কমিশনার এনভিল। অন্ধকারের মধ্যে জাহাজের দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে গেলেন তিনি। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল এবং আমি তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলাম। যাবার সময় ৪নং দ্বীপে পাওয়া সেই ম্যাপটি নিয়ে গেলেন। অবশ্য ব্রিকহিলই সেটা নিয়ে যাবার জন্যে বললেন।

জাহাজে ম্যাপটির স্থান যে নিরাপদ নয় পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল। ঠিক হোল মিঃ এনভিল এটিকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানর ব্যবস্থা করবেন।

আমরা স্তম্ভিত, বিমূঢ়। রীতিমত শঙ্কিতও। মিঃ লকসলির মত একজন প্রবীণ নাবিকের অনুপস্থিতিতে ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল বিপন্ন হয়ে পড়লেন। বিপন্ন হওয়ার কারণও ছিল। কারণ, এ পর্যন্ত যে সব ব্যাপার ঘটে গেল তা ক্যাপ্টেনকে শুধু নয় জাহাজের প্রায় প্রত্যেকটি নাবিককে শুদ্ধ নির্জীব করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে মনোবল অটুট রেখেছিলেন মিঃ লকসলিই। তাছাড়া সম্মুখে যে বিপদের আশঙ্কা আমরা করছি তার মধ্যে স্কুইরেলকে বাঁচিয়ে রাখার মত যোগ্যতাও সম্ভবত ঐ একজনেরই ছিল।

এখন কি করা যেতে পারে?—এ প্রশ্ন আমাদের সকলেরই।

আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ এবং যোগ্য তাঁদেরকে ডেকে সেই রাত্রেই ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল একটি বৈঠকে বসলেন। প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিলেন নিজ নিজ দায়িত্ব। আমার উপর সম্পূর্ণ ভার পড়ল বেতারবিভাগের এবং আংশিক পাইলটিংএর।

আমি বললাম, দায়িত্বটা খুবই বেশী হোল, ক্যাপ্টেন। মানে আমার মত—

স্টপ, মিঃ বোস। তুমি বড় বেশী বক। এটা আমার আদেশ। এই কি যথেষ্ট নয়? ব্রিকহিল রীতিমত রেগে গেছেন।

মাফ করবেন ক্যাপ্টেন। আমি ঠিক এড়িয়ে যেতে চাইনি।

তবে কি? যোগ্যতা কথাটার কোন মানে আছে নাকি? যোগ্যতা নিয়ে পৃথিবীতে কেউ জন্মায় না। পরিস্থিতিই মানুষকে যোগ্য করে তোলে। বুঝলে?

আপনার আদেশ আমি পালন করার চেষ্টা করব।

হ্যাঁ, তাই করবে। আর তা বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে।

এই ভাবে আরও কিছু কিছু দায়িত্ব চাপান হোল প্রায় সকলেরই উপর। অবশেষে গভীর রাত্রে আমরা সকলেই নিজ নিজ কাজে চলে এলাম। আমি এলাম বেতার-কক্ষে। সহকারীরূপে মিঃ গ্রে এল আমার সঙ্গে।

বেতার-কক্ষে এসে গ্রে-কে মোটামুটি জানিয়ে দিলাম, কি কি তাকে করতে হবে। বললাম, আমি পরিশ্রান্ত। একঘণ্টা আমি বিশ্রাম নিতে চাই।

গ্রে বছর পঁচিশের ছোকরা। লাজুক প্রকৃতির। তবে বেশ শক্ত। বলল, কোন অসুবিধে হবে না। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি সব দেখছি।

গ্রে-র কথামত ইজিচেয়ারে নিজেকে আমি এলিয়ে দিলাম।

কতক্ষণ যে সেই ভাবে ছিলাম মনে নেই। দুশ্চিন্তা এবং ভয়— এই দুইএর মাঝখানে পড়ে ঘুম যে আমার মস্তিষ্কে সঙ্গে সঙ্গেই ভর করতে পারে নি সে কথা বলাই বাহুল্য। একটা ক্ষণিক তন্দ্রা মাঝে মাঝে নিজেকে ছেয়ে ফেলছিল। আবার মাঝে মাঝে জেগে উঠছিলাম।

গ্রে-র কণ্ঠস্বরে জেগে উঠতে হোল।

একটি অজ্ঞাত সংকেত! গ্রে চীৎকার করে উঠল।

আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, কি ব্যাপার, গ্রে?

ততক্ষণ রেডিও-ডায়েলের কাছে এসে গেছি। দেখলাম একটি লাল আলো কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আর তার পরই শোনা গেল কার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

ইয়েস। আমি স্কুইরেলকে উদ্দেশ্য করে বলছি।

হ্যাঁ। আমি স্কুইরেল থেকেই কথা বলছি। বললাম আমি।

দয়া করে আপনার দড়ির সিঁড়িটি ফেলে দেবেন কি? আমি আপনাদের বন্ধু। একটা সংবাদ দেবার জন্যে এসেছি ডঃ কাসাবুর নির্দেশমত! অত্যন্ত জরুরী। প্লিজ! জাহাজে কাউকে জানাবেন না।

ডঃ কাসাবু? তিনি তো—হ্যাঁ, কমিশনার এনভিলের ভাষায় তিনি তো নিহত হয়েছেন। তাহলে? বন্ধুর মত করে উপস্থিত এত রাত্রে কে? জাহাজে শুধুমাত্র গোপনে কি সে বলতে চায়? এও কি শত্রুর এক নতুন চাতুরা? ঝক্কি অনেক। লোকটা দেখা করতে চাইছে। বলছে জরুরী বার্তা। কাসাবুর নির্দেশ। মিঃ গ্রে-র দিকে চাইলাম।

গ্রে-রও যে মাথা গুলিয়ে গেছে বোঝা গেল। বলল, ফোন করব ক্যাপ্টেনকে?

শক্ত মুঠিতে তার হাত চেপে ধরে বললাম, না। দেখাই যাক কে এই আগন্তুক। বেতারে বললাম, ঠিক আছে। সিঁড়ি নামিয়ে দিচ্ছি। ও কে.।

ডায়েলের লাল বাতি নিভে গেল। কোমরের পিস্তলটি দেখে নিলাম। গ্রে-কেও প্রস্তুত হয়ে ক্যাবিনের একদিকে লুকিয়ে থাকতে বললাম। তারপর এগিয়ে গেলাম সিঁড়ি নামিয়ে দিতে।

সিঁড়ি বেয়ে ত্রস্তপদে উঠে এল এক নিগ্রো আগন্তুক। অন্ধকারের

মধ্যে সে যেন এক বিভীষিকা। আমার সঙ্গে করমর্দন করল। বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছ, কি বল ?

তা কি নতুন করে তোমাকে বলে দিতে হবে ? ডঃ কাসাবু নিশ্চয় তোমাকে বলেছেন সব। বললাম আমি।

ওঃ। গড্ ব্লেস্ হিম্। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক। একটা আর্তনাদের সঙ্গে গভীর ব্যথা যেন তার কণ্ঠস্বরে।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্টার। তাঁর পরিণতির কথা শত্রুপক্ষ আমাদের জানিয়েছে। আমরা সত্যিই খুব দুঃখিত।

ব্লাডি হেল্। এ ডগ্।

কিন্তু কি ব্যাপার ?

সে কথাই তোমাদের জানাতে এসেছি। সময় কম। জীবন আমারও বিপন্ন। তবে ডঃ কাসাবুর দশা আমার হবে না। তিনি একটু ভুল করেছিলেন। তাই এমনটি হোল।

দশা ?

সে কথা আগামী কালের কাগজ দেখেই না হয় জেনে নিও। এখন চল তোমার ক্যাবিনে।

আগন্তুককে নিয়ে আমি ক্যাবিনে ঢুকলাম। এবার তাকে দেখার সুযোগ হোল। লম্বায় প্রায় ছ ফুট। মসীকৃষ্ণ চেহারা। বছর চল্লিশের শক্ত ইস্পাত দেহ।

তাকে বসতে বললাম। সে একবার ক্যাবিনের 'চারদিকটা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল। তারপর বলল, ও. কে.। শোন। আমার সময় কম। সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। অবশ্য সমস্তই ডঃ কাসাবুর কথা।

বল।

প্রথম, মিঃ লকসলির কাছে যে ম্যাপটি ছিল, সেটা নিরাপদে রয়েছে তো ?

হ্যাঁ। আছে।

ওটা যেন নিরাপদে থাকে। জাহাজের বাইরে থাকাই ভাল।

তাই আছে।

ও. কে.। দ্বিতীয় কথা, তোমরা জাঞ্জিবার ছেড়ে কালই চলে যাও।

এটাও কি ডঃ কাসাবুর নির্দেশ ? বললাম আমি।

হ্যাঁ। মৃত্যুর পূর্বে এটাই তাঁর শেষ কথা ছিল। বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলল আগন্তুক।

ব্যাপারটা কিন্তু আরও পরিষ্কার করা দরকার। আমার তো সেটাই এখন বড় বলে মনে হচ্ছে।

আমি নাছোড়বান্দা হলাম।

ড্যাম ইউ অল্। আমি বলছি, কাল দুপুর বারোটার পর নোঙর তোমাদের তুলতেই হবে। নইলে কেউ তোমরা বাঁচবে না। বলি, তোমরা মরতে চাও ? আজ রাতে যে দারুণ শব্দ শুনলে তার কথা কি ভুলে গেছ ?

না, তা ভুলি নি। কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলাম আমি। আসলে লোকটার দৈত্যের মত চেহারা, তার উপর অমন খেঁকালো সুরে কথা—মনে হোল রক্ত বুঝি হিম হয়ে যাবে।

কি করে ঐ শব্দ হয়েছিল জান ? টেনে টেনে কথা বলল আগন্তুক। এ সেই শয়তান পিয়ার্সনের আর এক প্রাণঘাতী আবিষ্কার। সমুদ্রের উপর সে রেখেছিল একটি তীব্র শব্দসৃষ্টিকারী যন্ত্র। আর তোমাদের জাহাজের উপরে—প্রায় তিনশ' গজ উপরে সে একটি কৃত্রিম জমাট মেঘ সৃষ্টি করে রেখেছিল। বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে ঐ যন্ত্র

থেকে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে সে সেই তরঙ্গ ছুঁড়ে দিচ্ছিল ঐ মেঘের গায়ে। আর সেখান থেকে ঐ শব্দ প্রতিফলিত হচ্ছিল এমন কায়দায় যা বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করে শুধু তোমাদের কানেই তালা লাগিয়ে দেয়।

বলেন কি মিস্টার ? এ শব্দ আমরা ছাড়া আর কেউ শোনে নি ?

না। মেঘটাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছিল, যাতে করে সমস্ত শব্দতরঙ্গ এসে পড়ে শুধু জাহাজের ডেকে।

তবে কি মিঃ এনভিল যে যন্ত্রটি সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছেন—যার সঙ্গে চারটে বল লাগানো ছিল বাক্সটিকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে—সেটাই কি ঐ যন্ত্র ? এখন যে ওটা আমাদের কাছে রয়েছে সে কথা আর ফাঁস করলাম না।

বলো কি ? আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আগন্তুকের সারা মুখ—মিঃ এনভিল ওটাকে সংগ্রহ করতে পেরেছেন ?

আমার তো তাই মনে হয়।

হায় ভগবান ! দোহাই তোমার, তুমি যা বলছ, তাই যেন হয়। তুমি জান না মিস্টার, তন্ন তন্ন করে আমরা ওটিকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারি নি। ঐ যন্ত্রই তো তোমাদের জাহাজের অবস্থান পাঠিয়েছে সেই শয়তানটাকে। আর সেই ভয়ানক শব্দ সৃষ্টি করেছিল তোমাদের সাবাড় করার জন্যে।

এ আবার কি কথা !

হ্যাঁ, ঠিক তাই। সাংঘাতিক ওর প্রতিক্রিয়া। নাগাড়ে ঐ শব্দ যদি আর কিছুক্ষণ তোমরা শুনতে, তোমরা পাগল হয়ে যেতে। তোমাদের স্মৃতিশক্তি হারাতে। যাক। এখন রহস্য ব্যাখ্যা করার সময় নয়। আরও কিছু বলার রয়েছে। একটু থেমে খুবই নীচু গলায় বলল, ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলকে জানিও, তাঁর অনুচর মিঃ মিত্র এখনও জীবিত।

মিঃ মিত্র? তুমি নিশ্চয় কয়েক বছর আগে সেই অভিশপ্ত দ্বীপে নিহত মিঃ মিত্রের কথা বলছ না?

আমি তার কথাই বলছি। সে বেঁচে আছে এবং তোমাদেরকে সময়-মত সাহায্য করবে। তবে কথাটা আপাতত শুধু ক্যাপ্টেনকেই বলো।

এও কি সম্ভব? এ যে ভৌতিক ব্যাপার!

এমন সময় লোকটির জামার ভেতর থেকে কেমন যেন ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকার মত একটা শব্দ হোল। একবার। দুইবার। তিনবার। পরিষ্কার শুনতে পেলাম।

মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল সে। আমার সঙ্গে করমর্দন করল। আর অপেক্ষা না করে দ্রুত এগিয়ে গেল দড়ির সিঁড়ির কাছে। অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হোল সে। শুধু শেষবারের মত কথা শুনলাম তার। অনুনয়ের সঙ্গে বলল, আমার কথা লঙ্ঘন করো না, মিঃ বোস। কাল দুপুর বারোটার আগে তোমাদের নোঙর তুলতেই হবে।

বোস!—তা হলে লোকটি আমাকে চেনে দেখছি। যত সব ভূতুড়ে কাণ্ড।

দড়ির সিঁড়ি তুলে নিয়ে সরাসরি এলাম ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলের কাছে। আমার ডাকে হন্তদন্ত হয়ে শয্যা ত্যাগ করলেন তিনি। সংক্ষেপে সমস্ত কথা তাঁকে জানালাম। ভদ্রলোক তো ভয়েই আধমরা।

আমি বললাম, আজকের রাত কোন প্রকারে কাটতেই হবে।

পরদিন ভোরে স্থানীয় এক সংবাদপত্রে বিচিত্র একটি সংবাদ প্রকাশিত হোল:

বিশ্ববরেণ্য পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ কাসাবু মৃত

হত্যা? না আত্মহত্যা??

॥ জাঞ্জিবার ॥ ২৫শে মার্চ: অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা

জানাচ্ছি, গতকাল নিজের শয়নকক্ষে প্রখ্যাত পরমাণুতত্ত্ববিদ ডঃ কাসাবু মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। যদিও পুলিশ দপ্তর থেকে প্রকাশ করা হয়েছে তিনি হঠাৎ থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন, কিন্তু আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার মতে এ মৃত্যুর পেছনে রীতিমত এক রহস্য রয়েছে। ডঃ কাসাবুর প্রিয়তম ছাত্র নেগি বলেছে, রাত নটার সময় ডঃ কাসাবুর কক্ষ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ সে শুনতে পায়। শব্দটি শুধু তাঁর কক্ষের মধ্যেই শোনা যায়। কতকটা ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ। তারপরই ডঃ কাসাবু চীৎকার করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আসে। ডাক্তার বলেন, ডঃ কাসাবু মৃত !

সংবাদটি পড়তে পড়তে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমরা। বোঝা গেল, গত রাত্রের সেই আগন্তুকটি ঠিক কথাই বলে গেছে। কিন্তু কিছুতেই আমরা ভেবে পেলাম না, তারই বা আসল পরিচয় কি ? আর মিঃ মিত্র ? কি করে সে জীবিত থাকতে পারে ?

ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল বললেন, তুমি বিশ্বাস কর মিঃ বোস, তাকে আমরা—বলছি আমি নিজে তাকে কবর দিয়ে এসেছি। কবর দেওয়ার পর পনের মিনিট সেই কবরের পাশে বসে আমরা প্রার্থনা করেছি। তবু আমাকে বিশ্বাস করতে বল মিঃ মিত্র এখনও জীবিত ? ভগবান যেন তাই করেন। কিন্তু—?

কথা বলা আর শেষ হোল না। এমন সময় রেডিও ফোন এল। কমিশনার এনভিল কথা বললেন : ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল, আজ সকাল দশটার মধ্যে নোঙর তুলুন। কোন এক বিশেষ কারণ বশতঃ দুপুর বারোটার পর জাঞ্জিবার আর আপনাদের নিরাপদ নয়। নিউ-অর্লেন্স থেকে 'কেবল' এসেছে। জ্যামাইকা এবং জ্যাকসনভিল থেকে সময়

মত আপনি আবার নির্দেশ পাবেন। সুয়েজ হয়ে আপনারা অগ্রসর হবেন। আমরা নিয়মিত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। মাঝে মাঝে বেতার-তরঙ্গে গোলমাল দেখতে পাবেন। হয়ত আমাদের প্রেরিত তরঙ্গ ধরাও আপনাদের পক্ষে কখনও কখনও শক্ত হবে। তার জন্যে ভয় পাবেন না। আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের অন্যতম মিঃ এ্যালেকসি মুলার্ডকে সমস্ত জানান হয়েছে। ডঃ পিয়ার্সনের শয়তানী এবার হার মানবেই।

ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল বললেন, ধন্যবাদ। অনেক কষ্ট আপনাকে দিলাম। আপনার নির্দেশ পালন করব।

সেই দিনই অর্থাৎ ২৬শে মার্চ আর অপেক্ষা না করে আমরা জাঞ্জিবার ত্যাগ করলাম। তখন সকাল নটা বেজে ত্রিশ মিনিট। জাঞ্জিবারের সেই মাল চালানের ব্যাপারটা বোঝা গেল ভাঁওতা।

অদ্ভুত সেই দিনগুলি। ভাবতে গেলে আজ বিস্ময় এবং শিহরণ জাগে। আমাদের কারুর মধ্যে তেমন কথাবার্তা নেই। যে যার কাজ করে চলেছি যন্ত্রের মত। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল মাঝে মাঝে আসেন। জাহাজ পরিচালনার ব্যাপারে দুএকটা উপদেশ দেন। কখনও বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে একবার আমার দিকে অথবা আমার সহকারী গ্রে'র দিকে চেয়ে থাকেন। অনেক কথা যেন বলতে চান, কিন্তু পারেন না। কখনও বা করুণভাবে চেয়ে থাকেন সেই চেয়ারটার দিকে, লকসলি যার উপর বসত।

একটানা জাহাজ চলল কয়েকদিন ধরে—জাঞ্জিবার থেকে এডেন। তারপর লোহিত সাগর দিয়ে সুয়েজে। পোর্ট সৈয়দে দুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল জাহাজের মেরামতি কাজের জন্যে। পোর্ট সৈয়দে গিয়ে নিজেদের বেশ প্রফুল্লই বোধ করলাম। সম্ভবত সেটা

ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ার দরুন। এখানে জাহাজ থেকে নেমে শহরটা একবার ঘুরে নিলাম। অবশ্য ঘোরাটাই একমাত্র কাজ ছিল না। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কমিশনার এনভিলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। কারণ গত তুদিন হোল বেতারে তাঁকে ধরতে পারি নি।

এলাম শহরের একটি বড় পোস্ট অফিসে। এখান থেকে ট্রাঙ্ক কল করলাম জাঞ্জিবারে।

হ্যালো! হ্যাঁ। আমি স্কুইরেলের রেডিও-অফিসার মিঃ বোস বলছি।—হ্যাঁ। আলেকজেণ্ড্রিয়া?—না না। আমরা এখন পোর্ট সৈয়দে আছি। কিছু মেরামতি কাজ চলছে। কি বললেন? —হ্যাঁ। তা তুদিন তো লাগবেই।

এনভিলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ, মিঃ বোস। আমিও বার বার চেষ্টা করেছি তোমাদের বেতারে ধরতে। পারি নি। শয়তানরা আমাদের তরঙ্গকে মাঝপথে কি করে যেন নষ্ট করে দিচ্ছে। আলেকজেণ্ড্রিয়ায় একবার জাহাজ ভেড়াবে। সেখানে আমার একজন এজেন্ট তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে কাস্টমস হাউসে। খুব গোপনে তার হাতে সাগর থেকে তোলা সেই বলওয়ালা যন্ত্রটি দিয়ে দেবে। আমি ওটিকে পরীক্ষা করবার জন্যে প্লেনে ফ্লোরিডার জ্যাকসন ভিলে পাঠাচ্ছি।

আপনার এজেন্টের কোড?

ডাবল সিকস টেন।

ও. কে.।

হ্যাঁ, আর একটি কথা। শুনলাম ডঃ কাসাবুর সহকারী মিঃ নেগি তোমাদের সঙ্গে দেখা করেছে। সে বলছিল, বলওয়ালা অমন আর কোন যন্ত্র তোমাদের জাহাজে থাকলে তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে। আসলে ওটিই নাকি তোমাদের সর্বনাশের মূল কারণ। তার ধারণা

অমন আরও একটি যন্ত্র জাহাজের কোন গোপন জায়গায় অথবা কাছেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ যন্ত্রই নিয়মিত তোমাদের জাহাজ কোথায় আছে, কোথায় যাচ্ছে তা শত্রুপক্ষকে জানিয়ে চলেছিল। আজ সকালে নেগি আমাকে রিপোর্ট দিয়েছে, এখনও নাকি শত্রুপক্ষ ঐ একই ভাবে তোমাদের জাহাজের সমস্ত খবর জানতে পারছে। এমন কি তোমরা যে পোর্ট সৈয়দে নোঙর করেছ, সে কথাও।

বলেন কি মিঃ এনভিল? বেশ ঘাবড়ে গেছি আমি।

নেগি সেই কথাই বলেছে। আর সে যে সত্যিকথা বলেছে, তা তোমার পোর্ট সৈয়দ থেকে ফোন করা দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার কথা শোনার আগেই নেগির সঙ্গে আমার দেখা হয়। একটু থেমে একটানা বলে যেতে লাগলেন এনভিল—শুধু তাই নয়। জাহাজের মধ্যে যতক্ষণ তোমরা থাকছ তোমাদের সমস্ত গতিবিধি তারা লক্ষ্য করছে। —হ্যাঁ। একটা কথা বলে নিই। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলকে একটু পাহারায় রেখো। নেগি বলছে, শত্রুপক্ষ এবার ব্রিকহিলকে লোপাট করার তালে আছে। তার ব্যবস্থাও নাকি অনেকটা হয়ে গেছে।

মানে, নেগি একথা আপনাকে বলেছে—?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। নেগি বলেছে। তুমি যা ভাবছ তা নয়। নেগি আমাদের পক্ষেরই লোক। ও যে সৎ তার প্রমাণ আমার হাতে এসেছে। —ওয়েল! অল্ রাইট। লাইন কাটছি।

আচ্ছা!

আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। কথা বলার ক্ষমতা আমার নেই। সঙ্গে গ্রে ছিল। বললাম, জাহাজে চল।

জাহাজে ফিরতে ফিরতে দুটো বাজল। জাহাজে উঠে প্রথমেই গেলাম ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল কি একটা বই

পড়ছিলেন। তাঁকে আর না ঘাঁটিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম তাঁর কক্ষে। ব্রিকহিল একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন।

বললাম, মানে—একটু দেখছি এখানে কোন মেরামতির কাজ আছে কিনা। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তল্লাস করা।

ক্যাপ্টেন নিজের পড়ায় মন দিলেন।

সেখানে নতুন কিছু দেখলাম না।

এলাম বাইরে। আর সমস্ত ক্যাবিনও তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করলাম। জাহাজের খোল, ডেক, মাস্ট, প্রপেলার—সমস্ত। কিন্তু এনভিল যার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার কোন চিহ্নই কোথাও নেই।

ট্রাঙ্ক কলের কথা রাত্রে ক্যাপ্টেনকে বললাম। অবশ্য শুধু ঐ যন্ত্রটির হস্তান্তর ছাড়া সমস্ত কিছু চেপে গেলাম।

এরপর আরও কয়েকটি দিন নিরাপদেই কাটল। কমিশনার এনভিলের কথামত সেই বলওয়ালা যন্ত্রটি আলেকজেণ্ড্রিয়ায় এসে নির্দিষ্ট এজেণ্টদের হাতে অর্পণ করলাম। এজেণ্ট আফ্রিকা দেশীয়। শুধু কোড বিনিময় ছাড়া আর কোন কথা তার সঙ্গে হোল না। লোকটিকেও কেমন যেন চাপা মনে হোল। তাই নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করার সাহসও হোল না। আলেকজেণ্ড্রিয়া থেকে যাত্রা করে মাল্টা এবং ইভিজা দ্বীপ হয়ে শেষ পর্যন্ত জিব্রাল্টার। জিব্রাল্টার থেকে পোর্ট অ্যাজোর্স।

দেখতে দেখতে কয়েক হাজার মাইল অতিক্রম করে এলাম। আর সব চাইতে মজার ব্যাপার আমাদের এই দীর্ঘ যাত্রায় আর কোন রকম ব্যাঘাত হয় নি বা শত্রুপক্ষের কোন চালের সম্মুখে আমরা পড়ি নি। এই দীর্ঘপথ আমরা জাঞ্জিবার এবং জিব্রাল্টারের সঙ্গে নিয়মিত খবরা-খবর চালিয়ে গেছি। মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলের

উপর নজর রাখতে হয়েছে। কমিশনার এনভিলও বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। ব্রিকহিলকে নাকি শত্রুপক্ষ লোপাট করবেই।

অ্যাজোর্স বন্দরে এসে কমিশনার এনভিলের কাছ থেকে আরও কয়েকটি নির্দেশ পেলাম। প্রথম, জাহাজ এবার সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চালিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা বরাবর নিয়ে আসতে হবে ভিলা-সিসনেরাস দ্বীপ পর্যন্ত। দ্বিতীয়, সেখানে একদিন অবস্থান করে ঐ কর্কট ক্রান্তি রেখা বরাবর এগিয়ে যেতে হবে পোর্ট রিফোর দিকে। পোর্ট রিফোর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এখান থেকে স্কুইরেলের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। একথাও জানালেন, ভিলা-সিসনেরাস দ্বীপের পর তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে না। অবশ্য তার প্রয়োজনও নেই। যা কিছু করার, পোর্ট রিফোর কর্তৃপক্ষই করবেন।

কমিশনার এনভিলের যাবতীয় নির্দেশ আমরা পালন করলাম। অ্যাজোর্স থেকে বাঁকা পথে আবার আফ্রিকার উপকূল ধরে ভিলা-সিসনেরাস দ্বীপে আমাদের কেন যেতে বলা হোল, তার কোন অর্থ বোঝা গেল না।

তবু আটলান্টিক মহাসাগরের এই দীর্ঘ পথও আমরা অতিক্রম করলাম।

কিন্তু এত তৎপরতা সত্ত্বেও ভিলা-সিসনেরাস ছেড়ে আসার পর যে আবার আমাদের পাগল হতে হবে একথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরে-ছিলাম? আমরা কি কল্পনাও করেছিলাম, একের পর এক বিদঘুটে কতকগুলি খবর এবং ঘটনা আমাদেরকে বিহ্বল করে তুলবে? আর ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলকে সত্যি সত্যিই বিপদের মুখে পড়তে হবে?

ভিলা-সিসনেরাস ছাড়ার তিন দিন পর হঠাৎ বেতার যন্ত্রে এক নতুন সঙ্কেত ভেসে এল। গ্রে প্রথমটায় চমকে উঠেছিল।

বললাম, ব্যাপার কি ?

কিছুই বুঝতে পারছি না।

গ্রে রিসিভারটি আমার কানে তুলে দিল। কানে ভেসে এল : স্পিকিং স্কুইরেল ? হ্যালো—হ্যালো ?

ইয়েস। জবাব দিলাম।

মিঃ লকসলির খবর ? অজ্ঞাত কণ্ঠস্বর কথা বলল।

মিঃ লকসলি ? আপনি কে কথা বলছেন মশায় ? লকসলির ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ কেন ?

ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাদের বন্ধুই কথা বলছি। মিঃ লকসলির নির্দেশে আপনাদের জানাচ্ছি, মিঃ লকসলি শত্রুদের সঙ্গেই নিরাপদে রয়েছেন। তাঁর সংবাদ অথবা তাঁর কণ্ঠস্বর আজই শুনতে পাবেন।

অর্থাৎ ? মানে আপনার পরিচয়টা দয়া করে দিয়ে আপাতত রেহাই দিন, মশায়—

শুনুন। একটানা বলে যেতে লাগল সেই কণ্ঠস্বর : ভয় পাবেন না। যথাসময়ে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। ক্যাপ্টেনকে জানাবেন মিঃ মিত্র অর্থাৎ তাঁর পুরনো অফিসার এখন নিরাপদে রয়েছেন। আর তাঁর কন্যা লরাও সুস্থ। উতলা হওয়ার কারণ নেই। শয়তান পিয়ার্সন এবার রেহাই পাবেন না।

পরক্ষণেই ভেসে এল এক অমানুষিক চীৎকারের শব্দ। রেডিও সিগন্যালের লাল বাতি কেঁপে উঠল। বক্তার কোন কণ্ঠস্বর আর শোনা গেল না। তার পরিবর্তে ভেসে উঠল যার কণ্ঠস্বর, বললেও যেন গা শিউরে ওঠে। কথা বলল, ডঃ পিয়ার্সন স্বয়ং। কি গম্ভীর তার গলার শব্দ—দৃঢ়, স্পষ্ট এবং হৃদয়ভেদী।

মিঃ বোস, বৃথা চেষ্টা করছ তোমরা !—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গ্রে'র দিকে চেয়ে কি হবে ? আমি তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমি

আবারও বলছি। সব বৃথা হবে। আমাদের যে ম্যাপটি ব্রিকহিল আমেরিকায় পাঠিয়েছে, সেটি ফেরৎ দিলেই আমরা শান্ত হব। শেষবারের মত সুযোগ দিচ্ছি। ক্যাপ্টেনকে বলো, সে যেন আর বোকামি না করে।

আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

ততক্ষণে ভয়ে এবং বিস্ময়ে আমি আর গ্রে নিথর হয়ে গেছি। বলে কি ডঃ পিয়ার্সন? গ্রে'র দিকে একবার চেয়েছিলাম তার কথা শুনতে শুনতে, সেটাও দেখতে পায় সে? পিয়ার্সনের আগেই বা কে কথা বলল? অমন একটি অমানুষিক চীৎকারই বা হোল কেন?

কিন্তু চমকের পালা তখন সবে শুরু হয়েছে। এসমস্ত কথা ভাবতে না ভাবতেই আবার বেতার যন্ত্রে নতুন কণ্ঠস্বর ভেসে এল। লকসলির গলা।

কি ব্যাপার? বেঁচে আছেন তো? বললাম আমি।

নিশ্চয়! চালাকি এবার সব শেষ হবে। বাব্বা, যে অভিজ্ঞতা পেলাম, হাড়ে হাড়ে তা মনে থাকবে। লকসলি কথা বলার সময় কোন ভূমিকার অবতারণা পছন্দ করেন না।

দাঁড়ান মশায়, আগে বলুন কোত্থেকে আপনি কথা বলছেন?

কেন? বিশ্বাস হয় না বুঝি? একেবারে শত্রুর আস্তানায়। পরে বলব সব। এদিকের ব্যবস্থা পাকা। শুধু ফ্যাসাদ পাকাচ্ছ তোমরা। তোমাদের জাহাজে এখনও একটি যন্ত্র ওরা লাগিয়ে রেখেছে। ওটা আছে জাহাজের খোলের বাইরে, জলের নিচে সম্ভবত হাল বরাবর। ঐ যন্ত্রই তোমাদের সমস্ত নিশানা পাঠিয়ে চলেছে ওদের আস্তানায়। ওয়েল। আর কথা নয়। পরে।

মনে হোল অনেক কথা বলতে গিয়েছিলেন লসকলি। সম্ভবত সুযোগ পেলেন না। তা হোক, যে যন্ত্রটির ইঙ্গিত তিনি দিলেন তার তল্লাসের জন্য উঠে পড়লাম।

সমস্ত ব্যাপার ব্রিকহিলকে জানাতে তিনি রীতিমত চমকে উঠলেন। কন্যার নিরাপদ সংবাদে খুশী যেমন হলেন, মিঃ মিত্রের জীবিত থাকার সুসংবাদটা ঠিক তেমনই বিহ্বল করল তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের খোলের বাইরে জলের নিচে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হোল। আর সত্যি সত্যিই পাওয়া গেল আর একটি নতুন বস্তু। জিনিসটি আবিষ্কার করল আমাদের ক্রু বিল। জাহাজের যেখানটায় হাল রয়েছে, ঠিক তারই নিচে জলের প্রায় তিন ফুট গভীরে একটি আয়তাকার এভার-ব্রাইট স্টিলের বাক্স। লম্বায় ফুট দুয়েক। চওড়ায় এক ফুট। পাশে অভ্রের মত চকচকে কতকগুলি প্লেট আঁটা। নিচে প্রায় দশ বর্গ ইঞ্চির একটি তারের জাল। তারই পাশে এক ইঞ্চি গভীর একটি গর্তের মধ্যে খুব ক্ষীণ একটি বাল্ব জ্বলছে। আর তা থেকে বিকিরিত হচ্ছে ঈষৎ নীল আলো। বাক্সটি এমনভাবে তৈরী যে কি ভাবে তাকে খোলা যেতে পারে তা বোঝাই গেল না।

মিঃ গ্রে বাক্সটিকে ক্যাবিনের খোলা জানালার ধারে রাখল। ব্রিকহিল এবং আমি সেটিকে দেখতে লাগলাম। বিল গেল বাক্সটিকে ভাঙ্গার যন্ত্রপাতি আনতে। কিন্তু তাকে আর এগোতে হল না। হঠাৎ ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলের হাতের ধাক্কা লাগল বাক্সে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার উপরকার তারের জালটি খুলে গেল। খুলে গেল ভৌতিক ডালাটিও, যাকে আমরা সনাক্ত করতে পারি নি। সশব্দে কালো রঙের কি একটি পদার্থ ছুটে বেরিয়ে গেল ক্যাবিনের বাইরে— একেবারে সাগরের জলে। আর একটু হলে ক্যাপ্টেনের গায়েই পড়ত সেটা।

বাইরে চাইতেই মনে হোল প্রায় দু'শো গজ দূরে যেন গিয়ে পড়ল জিনিসটা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। তারপরই শুরু হোল প্রবল জলোচ্ছ্বাস। মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল কিছুই বোঝা গেল না। আমি

ছুটতে ছুটতে এলাম পাইলটিং রুমে। পাইলটকে হুকুম দিলাম, তাড়াতাড়ি জাহাজ দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। এরই মধ্যে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল জাহাজের গায়ে। জল এসে ভাসিয়ে দিতে লাগল ডেক। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল নিজে পাইলটকে সাহায্য করতে লাগলেন জাহাজটিকে বাঁচানোর জন্যে। সে কি প্রবল সংগ্রাম! কমিশনার এনভিলের নির্দেশমত খবর পাঠালাম ফ্লোরিডার জ্যাকসন-ভিলের কর্তৃপক্ষকে। তার কোন উত্তরও এল না।

ঠিক ঐ ভাবেই চলল কমপক্ষে দুই ঘণ্টা। বেশ খানিকটা স্থান জুড়ে যে তাণ্ডব চলল তা কল্পনারও বাইরে। তবু ঈশ্বরের দয়ায় আমরা রক্ষা পেলাম।

ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় বেশ খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে বললাম, আপনি বিশ্রাম করুন স্যার। ব্যাপারটা আমরাই দেখছি।

আর সেইদিন রাত্রেই পাকা সংবাদ এল লকসলির কাছ থেকে: মিঃ বোস, শত্রুপক্ষ আর তোমাদের সংবাদ রাখতে পারছে না। আমিও অনেকদূর এগিয়েছি। ওদের সমস্ত শয়তানীর এবার শেষ হবে। নেগির সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে।

নেগি? জাঞ্জিবারে যে লোকটি রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করে—সেই কি তাহলে নেগি?

হ্যাঁ। ওর সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয়েছে শুনলাম। ও সম্ভবত পানামাতে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে। ইতিমধ্যে জ্যাকসনভিলের হেডকোয়ার্টার্স থেকে ওঁদের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ বোর এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডঃ হে'র সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। কি ভাবে তোমাদের অগ্রসর হতে হবে, ওঁরাই যথাসময়ে তোমাকে জানাবেন।

নির্বাক শ্রোতার মত লকসলির কথা শুনে গেলাম। একটা ক্ষীণ ভরসা মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল।

এ পর্যন্ত যা বলেছি তার সবটাই আমাদের কথা। যা আমরা দেখেছি, যা আমাদের করতে হয়েছিল, শুধু তাই। পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধের জন্যে মিঃ লকসলির নতুন অভিজ্ঞতার কথা এখানে জুড়ে না দিয়ে পারলাম না। পরে সমস্ত অভিযানটির কথা যখন লিখতে শুরু করি সেই সময়ে মিঃ লকসলি তাঁর অমূল্য এবং রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেন। আমার মনে হয় তাঁর সে কথা এখানে না লিখলে মূল ঘটনাটাই সকলের কাছে ধোঁয়াটে হয়ে থাকবে।

সেদিন জাহাজের খোলের মধ্যে লকসলি সেই অদ্ভুত মূর্তি দুটি দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন দারুণ। জাঞ্জিবারে মিঃ এনভিলের নির্দেশে যখন আমরা সদাত্রস্ত এক অজানা আশঙ্কার প্রতীক্ষায় সময় গুনছিলাম মিঃ লকসলি আমাদের অজ্ঞাতসারে তখন উপস্থিত হয়েছিলেন জাহাজের একটি চোর-কুঠরিতে। সঙ্গে ডঃ কাসাবুর আবিষ্কৃত সেই অদ্ভুত ক্যামেরা। মিঃ এনভিলের নির্দেশে তিনি ক্যামেরাটিকে সেখানে রেখে দিলেন। এ কথা জাহাজের আর কেউই জানতে পারল না। ডঃ কাসাবু জানতেন পিয়ার্সনের চর সেদিন জাহাজে হানা দেবেই। মুখোস পরা সেই দানব দুটিকে, ৪নং দ্বীপে একদিন যাদের দেখা গিয়েছিল, সে পাঠাবে জাহাজ তল্লাস করার কাজে। এই বিশেষ ধরনের ক্যামেরার মধ্যে সেই দানব দুটির ফটো আগে থেকেই তোলা ছিল বেতার তরঙ্গের সাহায্যে। আর সেই ফটো সংরক্ষিত করা হয় টেপ রেকর্ডারের মত এক ধরনের যন্ত্রে।

যার ফলে সাদা চোখে তা কারুরই নজরে পড়ে না। ক্যামেরাটির মধ্যে আর ছিল গামা রশ্মি বিকিরণকারী যন্ত্র। অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু ভয়ঙ্কর। টেপের মধ্যে যাদের ফটো রয়েছে যদি একবার তারা ঐ ক্যামেরার সম্মুখে উপস্থিত হয় সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই ঐ গামা রশ্মি বিকিরণকারী যন্ত্র চালু হয়ে যাবে। আর মুহূর্তের মধ্যে সেই রশ্মির তেজে দানব দুটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে। ওরা ছাড়া আর কেউ এলে কিছুই হবে না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ডঃ কাসাবু শুধু পিয়ার্সনকে সাজা দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেন।

তারপর এল রাত্রি। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এক পাশে সরে গেলেন মিঃ লকসলি। দূর থেকে ক্যামেরাটির প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলেন তিনি। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, একবার যদি তারা আসেই নিশ্চয় ব্রিকহিলের ক্যাবিনের দিকে এগুবে। আর তা হলেই যেতে হবে ঐ চোর কুঠরির সম্মুখ দিয়ে।

কিছুক্ষণ পরই শুরু হোল সোরগোল। জাহাজের সমস্ত আলো গেল নিভে। আর তারপরই—! উঃ! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আবার—! আবার সেই মূর্তি। জাহাজের পেছন দিক থেকে ক্ষিপ্র গতিতে উঠে এল। এসেই থমকে দাঁড়াল একবার। দুজনেরই মাথার ওপর বেগুনী আলো। জ্বলছে, নিভছে। একবার তারা ছুটে গেল মাস্তুল বরাবর। আবার থামল। কিন্তু তারপরই দ্রুত জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিল সাগরের জলে। আর সেই মুহূর্তে শুরু হোল প্রচণ্ড শব্দ। ফলে ওদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ কারুরই কানে গেল না।

অপেক্ষা করলেন না লকসলি। প্রথম দিকে ভয় পেলেও নতুন করে একটা দানবিক বল যেন অনুভব করলেন তিনি। এক অবসরে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়লেন।

জাহাজের মধ্যে তখন পিচঢালা অন্ধকার। হাতের পেন্সিল

টর্চটি জ্বেলে সোজা চলে এলেন তিনি তাঁর প্রিয় ডুবোজাহাজ এ্যান্টিলোপের কাছে। মুহূর্তে জাহাজটিকে জলের মধ্যে সোজা নামিয়ে একটি গভীর স্থানে এসে দাঁড়ালেন। রাতের অন্ধকার। মাথার উপর প্রায় একশ ফুট গভীর জল। তারই মধ্যে দিয়ে দেখা গেল বেশ কিছু দূরে ছোট বড় সামুদ্রিক মাছের রঙ-বেরঙী আলো। আর তাদের মধ্যে একটি হলুদ রঙের আলো নিভছিল, আর জ্বলছিল। আলোটি প্রায় মিনিট পনের একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে যেতে লাগল সম্মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটি ঐ রকম আলো জ্বলে উঠেই অনুসরণ করল আগের আলোটিকে।

মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ডুবোজাহাজের পরিচালনা যন্ত্রে হাত রাখলেন লকসলি। তারপরই নীরবে অনুসরণ করে চললেন ঐ আলোর সারি। আধঘণ্টা চলার পর তাঁর বেতার যন্ত্রে ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর : হ্যালো, হ্যালো লকসলি! হ্যালো, মেরিনার লকসলি! আমি নেগি কথা বলছি। ইয়েস। আপনার বন্ধু। সাবমেরিন ওপরে তুলুন। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

একটু ঘাবড়ে গেলেন লকসলি। এ আবার কি কাণ্ডরে বাবা? নেগি? এ আবার কোন ভূত? লকসলির এবার তালগোল পাকিয়ে ফেলার মত অবস্থা। এ যে খোদার ওপর খোদকারি। কোথায় তিনি নিজেই দুরদুর বুকে অপরের অনুসরণ করে চলেছেন, আর তারই ওপর চোখ রেখে আর একজনের চলা। শুধু তাই নয়, লোকটি তার নাম শুদ্ধ ডেকে ফেলল। সমস্ত কেমন আজগুবির মত মনে হচ্ছে!

অথচ সবকিছু এত দ্রুত এবং বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে যাচ্ছে যে আসলে সত্যিকারে কি যে হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একমনে শত্রুর পেছনে ধাওয়া করতেই নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু তার ফাঁকে এ আবার কে বন্ধু হয়ে অযাজিত ভাবে তাঁকে সাহায্য করতে এল?

যেন কিছুই ভাবতে পারেন না লকসলি।

খানিকটা সন্দেহ মেটানর জন্যেই বললেন, নেগি? নেগি নামে কাউকে তো আমি জানি না? বলি, আপনার মতলবটা একবার দয়া করে বলবেন, মশায়? যদি সত্যিই আমার ঘাড় মটকাবার মতলব আপনি করে থাকেন, দোহায় আপনার, এখনই মটকে দিন। সব সাফ হয়ে যাক। আপনারাও বাঁচেন, আমরাও বাঁচি। লকসলি এবার মরিয়া।

একি বলছেন আপনি, মিঃ লকসলি? প্লিজ। কথাটা শুনুন। আমি আপনাদের বন্ধু। আমার পরিচয় পরে দেব। আর মুহূর্ত দেরি না করে এক্ষুণি ওপরে উঠে আসুন। নেগির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

বেশ আপনার কথা মতই তাহলে চলি। ভাগ্য খারাপ হলে ব্যাঙেও নাকানি চুবানি খাওয়ায়। লকসলির কণ্ঠস্বরে দ্বিধা।

ভাগ্য আপনার খারাপ নয়, মিঃ লকসলি। অপর পক্ষের জবাব।

লকসলি ডুবোজাহাজের জলের ট্যাঙ্ক খালি করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটি ওপরে ভেসে উঠতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ড। হ্যাঁ, এবার তিনি জলের ওপর।

সাগরের বুকে ভাসতেই লকসলি অদূরে একটি মোটর লঞ্চ লক্ষ্য করলেন। নেগির মোটর লঞ্চ। কোন কথা বলার আগেই সেটি তাঁর দিকে এগিয়ে এল। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মিশ কালো একখানি মুখ। দুপাটি দাঁত বের করে হাসছে।

ইয়েস স্যর-র। আমিই নেগি। রাইট? কথা বলল নেগি?

ইয়েস! লকসলির যেন ভাষা ফুরিয়ে গেছে।

কোন ভূমিকা না করে নেগি সংক্ষেপে তার পরিচয় দিল। তারপর মাকড়সার জালের মত দেখতে একটি ছোট যন্ত্র দিল লকসলির হাতে। জালটি বৃত্তাকার। ব্যাস প্রায় দু হাত।

নেগি বলল, আপনার ডুবোজাহাজের মধ্যে এটি রাখবেন। তা হলে শত্রুপক্ষ বেতার-বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আপনার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ডঃ কাসাবু এটি তৈরি করেছেন। এর নিচে যে বাক্সটি দেখছেন, এর মধ্যে আছে বিশেষ এক প্রকারের তড়িৎ-কোষ। বাক্সের এক নম্বর বোতামটি টিপে দিলেই যন্ত্রটি চলতে থাকবে। শত্রুরা তখন আপনার উপস্থিতি সহজে জানতে পারবে না। আরও দু একটি খুঁটিনাটি উপদেশ দিয়ে চলে গেল সে। লকসলিও আবার ডুব দিলেন সাগরের নীচে।

এর পরের দিনগুলি তাঁর কাটল দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে। নেগির দেওয়া যন্ত্রটি ঠিকমত চালিয়ে ডুবোজাহাজের ক্যাবিনে এসে বসলেন তিনি। হিসেব করে দেখলেন, ডুবোজাহাজে খাবারও কিছু রয়েছে। সবই শুকনো। তবে তাতে দিন পনের চলে যাবে। অবিশ্রান্ত চলল জাহাজ। সাত দিন, সাত রাত। সম্মুখের সেই আলোর সারিও এগিয়ে চলেছে একই গতিতে। মাঝে মাঝে ম্যাগনেটোমিটারে চোখ রেখে ডুবোজাহাজের গতিপথ দেখে চলেছেন লকসলি। প্রায় হাজার খানিক মাইল পথ অতিক্রমও করে গেলেন। আর ঠিক দশদিন অবিশ্রান্ত চলার পর যখন সম্মুখের আলোগুলি থেমে গেল, তিনি তার ডুবোজাহাজটিকে থামালেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একটি ক্ষীণ সবুজ আলো আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ঐ হলুদ আলোর সারির মধ্যে। তারপরই একটি লাল আলো জ্বলে উঠতেই সমস্ত আলো আবার আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। সেই সঙ্গে লকসলিও চললেন পিছু পিছু। প্রায় একঘণ্টা চলার পর লকসলির মনে হোল, কি একটি শক্ত জিনিসের সঙ্গে যেন তাঁর ডুবোজাহাজটি ঘষে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থামালেন এবং উঁকি মেরে দেখেই চমকে উঠলেন তিনি। এ যে একটি ডুবো পাহাড়! তা হলে? হায় ভগবান! আর একটু হলেই যে আজ সাবাড় হয়ে যেত সব!

ঠিক ঐ মুহূর্তে চোখের সামনের সেই আলোর সারিও অদৃশ্য হয়েছে। রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন লকসলি। এ কোন রাজ্যে এসে পড়লেন তিনি? এত চেষ্টা, এত ঝক্কি—এ সমস্তই কি বিফলে গেল? ম্যাপ এবং যাত্রার পথের চার্ট দেখে মনে হোল, সম্ভবত তিনি এ্যান্টিপোডস দ্বীপপুঞ্জের কাছে অবস্থান করছেন। অর্থাৎ এখন তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে।

কিন্তু পরদিন সকালেই আবার নতুন উত্তেজনা। সর্বনাশ! এই তো সেই দ্বীপ? সেই প্রাণঘাতী দ্বীপের কাছে এসে গেছেন তিনি! তা হলে? অবাক বিস্ময়ে চারদিক দেখলেন বার বার। তখনও ভোর হয় নি। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নেমে আসছে দিনের আলো। তবু সেই অস্পষ্ট আঁধারেই তাঁর মনে হোল সামান্য কিছু দূরে জলের উপর যেন একটি কাঠামোর মত কি দাঁড়িয়ে। জল থেকে প্রায় ফুট পঞ্চাশেক উপরে। আর তারই উপর একটি বিরাট জাল। জালটি সম্ভবত ধাতুর। জালের মধ্যে একটি লাল আলো জ্বলছে।

সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত মিঃ লকসলি ডুবোজাহাজটিকে জলের নীচেই রাখলেন। দীর্ঘ এই কয়দিন একটানা জাহাজ চালিয়ে পরিশ্রান্তও হয়ে পড়েছিলেন খুব। কিছু খেয়ে নিয়ে সারাদিন ঘুমিয়ে নিলেন একচোট।

ঘুম যখন ভাঙ্গল, তখন আকাশে আবার নেমে এসেছে ভরা অন্ধকার। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেছে। অন্ধকার যতক্ষণ না জমাট বাঁধে ততক্ষণ অপেক্ষা করলেন তিনি। রাত যখন ঠিক দশটা সেই সময় কিছু খাবার, একটি পিস্তল, গুলি, একটি ছোরা এবং আরও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে নেমে পড়লেন দ্বীপে। জাহাজটিকে ডুবিয়ে রেখে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন।

চারদিকে রহস্যময় স্তব্ধতা। পথ ঝোপঝাড়ে ভরা। তার মধ্যে দেখা গেল ছোটখাটো ইঁদুর বা ঐ জাতীয় জীব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পেন্সিল টর্চটার আলোয় ওদের যেন কেমন মনে হচ্ছিল। আর তার পরই—হঠাৎ মনে হোল একটি উজ্জ্বল বেগুনী আলো যেন মাটির নীচ থেকে উঠে এল। তার সঙ্গে একটি মানুষ—অন্তত তাই বলেই তো মনে হয়। মুখোশে ঢাকা। মূর্তিটি সোজা প্রায় হু'শ গজ দূরে একটি ছোট্ট পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল বেশ জোরেই। তারপর মাটির নীচে অদৃশ্য হোল।

প্রায় মিনিট দশেক পর আবার একজোড়া মূর্তি উঠে এল যেন ভুঁইফোঁড়ের মত। এবার তার খুব কাছেই। গজ পঞ্চাশেক দূরে হবে। ওরা প্রথমে তাঁর দিকেই লঘু পদে এগিয়ে এল।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন লকসলি। একহাতে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরলেন রিভলবার, আর এক হাতে টর্চ। শ্বাসরোধ হবার মত অবস্থা তাঁর। এই বুঝি তারা এসে পড়ে কাঁধের উপর। আর কি সাংঘাতিক ঐ বেগুনী আলো! চোখে পড়তেই সারা দেহ যেন অবশ করে দেয়।

মূর্তি হুটি খুব বেশী দূর এগোল না। মাত্র গজ দশেকের মধ্যে এসেই আবার ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পর আলোও অদৃশ্য হোল।

আর অপেক্ষা না করে মূর্তিগুলি যে দিকে গেল দ্রুতপায়ে সেদিকে এগোলেন লকসলি। হাতে টর্চের ক্ষীণ আলো। উঁচু নীচু পাথুরে পথের মধ্যে নানা রকম লতাপাতা প্রতি পদে তাঁকে বাধা দিতে লাগল। সমস্ত শিরা-উপশিরা রীতিমত নিস্পন্দ যেন। প্রতিটি মুহূর্ত যেন মৃত্যুর হাতছানি উঁচিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

কয়েক পা এগোতেই একটি পাথরে হোঁচট খেলেন লকসলি। আর কোন কিছু ভাবার আগেই মনে হোল তাঁর পায়ের তলার মাটি যেন কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই খানিকটা মাটি ফাঁক হয়ে গেল। পরিষ্কার ফুটে উঠল একটি গুহাপথ। ভেতর থেকে একটি আবছা আলো গুহার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। গুহাপথের সিঁড়ি বেয়ে আস্তে

আস্তে নেমে যেতে লাগলেন লকসলি। কয়েকটি বাঁক ঘুরে শেষ পর্যন্ত এসে উপস্থিত হোলেন একটি নির্জন হল ঘরে।

কিন্তু এ কি দেখছেন মিঃ লকসলি? জগৎ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সুদূর এক অজানা দ্বীপে এ কোথায় এসে হাজির হয়েছেন তিনি। বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগলেন লকসলি। ঘরের মধ্যে তীব্র বিদ্যুতের আলো। চারদিকে বিচিত্র রকমের যন্ত্রপাতি! কারুর উপর হলুদ আলো জ্বলছে আর নিভছে। কারুর উপর নীল অথবা লাল। কোন যন্ত্র থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মত শব্দ আসছে। কোথাও বা খট্ খট্ করে আওয়াজ। জনমানবশূন্য ঘরে যেন একটি কারখানা। সমস্ত যন্ত্র আপনা থেকেই কাজ করে চলেছে।

একের পর এক যন্ত্রগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সম্মুখে এসে পড়লেন লকসলি। অদ্ভুত এই যন্ত্রটির উপর বসান রয়েছে চার ফুট চওড়া এবং ছয় ফুট লম্বা পুরু কাচের একটি ঘষা প্লেট। তার উপর আবছাভাবে একটি মানচিত্র আঁকা রয়েছে। একপাশে আফ্রিকা আর এক পাশে আমেরিকা। মানচিত্রের এক কোণে একটি হলুদ আলোর বাল্ব। বাল্বটি অত্যন্ত ক্ষীণ। তার পাশে ইংরেজীতে লেখা: 'নিউ'। এর কিছু দূরে একটি লাল বাল্ব। এর পাশে লেখা 'স্কুই'। আসলে ব্যাপারটা যে কি কিছুই বোঝা গেল না।

কিন্তু খেলার তখন সবে শুরু। লকসলি জানতেন না বিপদ তখন তাঁর মাথার ওপর দাঁড়িয়ে।

খুট! একটি মৃদু শব্দ। ঠিক পেছন থেকে।

দেহের সমস্ত শিরা উপশিরার মধ্যে কে যেন বিদ্যুতের শক দিয়ে গেল। সেই শব্দে পেছনে চাইতেই মিঃ লকসলি ভয়ে আঁতকে উঠলেন। উঃ! কি দারুণ চেহারার একটি মুখোশধারী মূর্তি! লম্বায় প্রায় সাত ফুট। আপাদমস্তক কালো আস্তরণে ঢাকা। মনে হোল

চকচকে কি একটি পদার্থ দিয়ে তার ঐ আস্তরণ তৈরী হয়েছে। মুখোশ-ধারীর হাতে দস্তানা। চোখের উপর বাইনাকুলারের মত একটি যন্ত্র আটকানো রয়েছে। মাথার উপর একটি বেগুনী বাল্ব—জ্বলছে আর নিভছে।

সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি প্রবল ঝাঁকুনি বোধ করলেন যেন মিঃ লকসলি। ভয়ে আত্মরক্ষার জন্যে পকেটে হাত পুরে রিভলবারটা বের করার চেষ্টা করলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটি একটি কর্কশ শব্দ করে উঠল। আর সেই মুহূর্তে পাশের দেওয়ালের কাছ থেকে, মনে হোল কোন লাউড স্পিকার থেকে কে যেন হুকুম করল : অনুগ্রহ করে মাথার উপর হাত তুলুন, মিঃ লকসলি।

কণ্ঠস্বরে রীতিমত আদেশ। হাত তুলে দাঁড়ালেন লকসলি!

এ যে গোলকধাঁধা রে, বাবা! রীতিমত ভৌতিক কাণ্ড সব। লকসলির সারা গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। কে এই আদেশকারী? কি করে সে তার নাম জানল?

লাউড স্পীকার থেকে আবার শোনা গেল গম্ভীর কণ্ঠস্বর : আপনি চোরের মত আমাদের গবেষণাগারে প্রবেশ করেছেন, মিঃ লকসলি!

তারপর একটা হাসির দমক। আর কি দারুণ সেই হাসির শব্দ। যেন হাড়ে গিয়ে বেঁধে।

লোকটি বলে যেতে লাগল : আপনাদের চেষ্টা বৃথা। এ দ্বীপের রহস্য কখনই আপনারা ভেদ করতে পারবেন না। আর যার জন্য এত কষ্ট সহ্য, সেই নকশাটি আমাদের হাতে।

তার মানে? না, না। কিছুতেই তা হতে পারে না। আমি নিজে সেটিকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু একথা এখন আপনাকে বলতে বাধা নেই, যে নকশাটি নিউ

অর্লেন্সে রয়েছে, সেটা জাল। আপনাদের একজন নাবিককে আমরা চুরি করে এনে আমাদেরই একজনকে প্লাস্টিক সার্জারী করে, অবিকল তার চেহারায় রূপান্তরিত করে রেখে দিয়েছি আপনাদের জাহাজে। সে-ই আমাদের সাহায্য করছে। কাসাবুর মৃত্যু তারই জন্য হয়েছে। নেগিও রেহাই পাবে না।

সমস্ত মিথ্যে কথা! রেগে ফেটে পড়লেন লকসলি: তুমি একটি আস্ত শয়তান। মনে রেখো, তুমিও রেহাই পাবে না। বক্তার কণ্ঠস্বরে অট্ট হাস্য ধ্বনিত হোল: পুয়োর লকসলি! রীতিমত অবজ্ঞার স্বর। বলে যেতে লাগল—ডঃ কাসাবুও তাই ভাবত, শূয়োরটাকে বার বার আমি নিষেধ করি। রেডিও ক্যামেরার সাহায্যে সে আমার অনুচরদের হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। সে ব্যাপারে তুমিও অংশ গ্রহণ করেছিলে। বার বার কাসাবুকে আমি বলি যন্ত্রটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে, কিন্তু ইদানিং সে বড় বেশী ধার্মিক হয়ে পড়েছিল। অথচ জানত না, ওর মরণ-কাঠি আমারই কাছে। যে ঘড়িটি সে পরত, অবিকল আর একটি ঐ ধরনের ঘড়ি তৈরি করে আমার চরের সাহায্যে সেটিকে সরিয়ে ফেললাম। আর এর মধ্যেই ছিল কাসাবুর মৃত্যুবীজ। বিশেষ এক প্রকারের তেজস্ক্রিয় পদার্থের কণিকার ওপর বেতার তরঙ্গ ফেলে দূর থেকেই এই ঘড়ির মধ্যে রাখা যন্ত্র আমি চালু করি। ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে এমন এক ধরনের রশ্মি নির্গত হতে লাগল যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কাসাবু কিছুই বুঝল না। অথচ এই রশ্মি সরাসরি তার হৃৎপিণ্ডকে স্তব্ধ করে দিল। লোকে ভাবল সে থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হয়েছিল।

শুনতে শুনতে লকসলির দেহ যেন হিম হয়ে এল। কি ভয়ঙ্কর! কি ধড়িবাজ।—তাহলে কি কাসাবু সত্যিই বেঁচে নেই? যেন মরিয়া হয়েই বলে উঠলেন, তোমারও রেহায় নেই, শয়তান!

চারদিক ভাল করে দেখার চেষ্টা করলেন লকসলি। কিন্তু আশ্চর্য। তিনি এবং ঐ মূর্তিটি ছাড়া কোথাও কিছু নেই। অথচ লাউড স্পীকার সমানে কথা বলে চলেছে এবং বক্তা তাঁর হাবভাব সমস্তই লক্ষ্য করছে।

ব্যস। চুপ! খুব হয়েছে।

রহস্যময় বক্তার কণ্ঠে এবার ধমক।

এমন সময় ঘরের কোণে একটি সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। আর তার পরই সেই মূর্তিটি এগিয়ে এসে লকসলির একটি হাত ধরল। বহু চেষ্টা করেও সেই বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না তিনি।

মূর্তিটি তাঁকে নিয়ে একটি দেওয়ালের সম্মুখে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল ফাঁক হয়ে দেখা গেল আর একটি কক্ষ। এই কক্ষে একটি যন্ত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল চারজন লোক। সকলেরই দেহ মুখোশে ঢাকা। শুধু একজন আধুনিক ইউরোপীয় পোশাক পরে এদিক সেদিক ঘুরছে। চোখের উপর কালো পুরু লেন্সের চশমা।

চমকে উঠলেন লকসলি। কে এ? এই তো সেই মুখ। ছদ্মবেশে থাকলেও মনে হোল ভুল করেননি লকসলি। গত দশ বৎসর ধরে পৃথিবীর মানুষ যাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে কি না— ? তা হলে এই ব্যাপার— ? ও অবশ্য তাকে চেনে না।

পিয়ার্সন! অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন লকসলি।

লোকটি যেন চমকে উঠল। মনে হোল মুহূর্তের মধ্যে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। কক্ষে যারা ছিল তারাও। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। একটা সুইচ টিপল পিয়ার্সন। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটি কালো বাক্সের ডালা গেল খুলে, আর তার মধ্যে থেকে দুইটি বিরাট মূর্তি বেরিয়ে এসে চেপে ধরল লকসলিকে। কিম্ভুত এদের চেহারা। সারা দেহ মুখোশে ঢাকা। পরপর আরও কতকগুলি যন্ত্র

চালিয়ে দিল পিয়ার্সন। সমস্ত কক্ষে একটা মৃদু শব্দ হতে লাগল। মাথার উপরের একটি বিরাট লেন্স থেকে একটা তীব্র রশ্মি এসে পড়ল একটা মূর্তির উপর। মূর্তিটি কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি পাত্র থেকে কি একটি জিনিস তুলে নিল অপর মূর্তিটি। হ্যাঁ। হ্যাঁ। পরিষ্কার দেখতে পেল লকসলি। সেই পাতা! সেই প্রাণঘাতী পাতা! যা তাদের ভাগ্যকে দিয়েছে পাল্টে।

মূর্তিটি পাতাটিকে রাখল একটি টেস্ট টিউবের মধ্যে। মুহূর্তে টেস্ট টিউবের মধ্যে রাখা একটি তরল পদার্থ সবুজ হয়ে গেল। তারপর একটি সিরিঞ্জে খানিকটা সেই তরল পদার্থ নিয়ে সরাসরি তা ঢুকিয়ে দিল লকসলির দেহে। কোন বাধা দিতে পারল না সে। মনে হোল ঐ মূর্তি দুটির মাথার উপর যে আলো—সে আলো তার সমস্ত ক্ষমতাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে। দেহে এবং মনে কোন অনুভূতি নেই। না আছে কথা বলার শক্তি—না দৈহিক বল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান হারালেন লকসলি। তাঁর অচৈতন্য দেহ সেই মূর্তি দুটি বয়ে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

আর সেই মুহূর্তে। সেটা ১৫ই এপ্রিল। আমরা উপস্থিত হলাম ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিলের কাছে। পুলিশের বড়কর্তা জানালেন, আমরা যেন তাঁর কোন নির্দেশ ছাড়া আপাতত নোঙর না করি। তাই জাহাজ-ঘাট থেকে দূরেই সাগরের বুকে আমাদের অপেক্ষা করতে হোল। জাহাজে ব্যবহারের জন্য মিষ্টি জল এবং খাবারদাবার সরকার থেকেই পাঠানোর ব্যবস্থা হোল। আমরা তৎপরতার সঙ্গে ভবিষ্যতে আমাদের ভূমিকা কি হতে পারে দিনরাত তাই ভাবতে

লাগলাম। আর এখানেই দুদিন পর ধূমকেতুর মত এসে হাজির হোল নেগি। একেবারে আমার ক্যাবিনে।

তখন রাত প্রায় নটা। সাগরের বুকের উপর একটি খোলার মত আমাদের স্কুইরেল ভেসে রয়েছে। আমার সহকারী মিঃ গ্রে'কে ছুটি দিয়েছি। সে তার ক্যাবিনে বিশ্রাম করছিল। আমি রেডিও-যন্ত্রের সম্মুখে বসে কতকগুলি চার্ট মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। বহুদূরে সাগর-উপকূলকে রাতের অন্ধকারে বড় অদ্ভুত লাগছিল। যেন জলের উপর আলোর রেখা টেনে স্বপ্নপুরীর অচিন কোন দেশ। ওখানেই রয়েছে আমাদের যাত্রাপথের সংকেত—আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি।

হঠাৎ যেন ভূতের মত উপস্থিত হোল নেগি আমার ক্যাবিনে।

হ্যালো! মিঃ বোস!—

নেগি এসে সরাসরি বসল আমার সম্মুখে।

কি ব্যাপার? হঠাৎ তুমি এখানে, নেগি? বললাম আমি।

তাহলে আমার পরিচয় জানতে পেরেছ?

হাসল নেগি। বলল, আশা করি আমি ভুল করিনি?

হ্যাঁ, আমিও না। সেবার বড় জোর ধোঁকা মেরে চলে গিয়েছিলে। ধন্যবাদ।

না। দাঁড়াও, দাঁড়াও। চমকে ওঠার কারণ নেই। এবার কাজের অনেক সুরাহা করে এনেছি।

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, নেগি। কয়েক দিন ধরে লকসলির কোন সংবাদ নেই। তিনি যে কি ভাবে কোথায় রয়েছেন, কিছুই জানি না। এদিকে সেই যে তুমি চলে গেলে, তারপর তোমার আর পাত্তাই নেই—

একটু থেমে, মিঃ বোস। অত প্রশ্ন করলে একসঙ্গে আমার পক্ষে জবাব দেওয়া শক্ত হবে। এটুকু জেনে রাখ, তুমি আমার খবর না

রাখলেও, তোমাদের সমস্ত খবর আমি রেখেছি। সম্ভবত আগামী কালই তোমরা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাবে। গত তিন দিন হোল জ্যাকসনভিলেই আমি অপেক্ষা করছি। তোমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ সন্ধান করছিলাম। আপাতত এখানকার পুলিশের কাছে গা ঢাকা দিয়ে আমাকে থাকতে হবে। —আচ্ছা, হ্যাঁ। তোমাদের নাবিক বিল কেমন আছে, বলতে পার ?

বিল ? কি ব্যাপার ? একটু চমকেই উঠতে হোল আমাকে।

আর তাকে তুমি তোমার জাহাজে পাবে না। কতকটা ভ্যাংচানির সুরে কথা বলল নেগি।

কি বলতে চাও তুমি, নেগি ? বিরক্ত হলাম আমি।

কথাটা হোল, আসল বিল অনেকদিন হোল অক্কা পেয়েছে—মানে খুন হয়েছে। বিল সেজে যে এতদিন তোমাদের মত গবেটের ওপর মস্করা করে গেল, প্রতি পদে পদে তোমাদের নাজেহাল করল, সে মোটেই বিল নয়।

তার মানে ?

ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পারি নি, মিঃ বোস। শয়তানটার এ আর এক কারসাজি। আসলে সকলের অলক্ষ্যেই সে বিলকে লোপাট করে, তারপর প্লাস্টিক সার্জারী করে অবিকল বিলের চেহারার একজন স্পাই-কে জাহাজে রেখে যায়। এই লোকটি এত খল এবং চতুর যে তার অভিনয় লকসলির মত এবং তোমার মত চালাককেও ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কেটেও পড়েছে ঠিক সময়ে। সে খবর আজ বিকেলে আমি পেয়েছি।

এক নাগাড়ে বলে যেতে লাগল নেগি। আমি হতভম্বের মত শুনে যেতে লাগলাম তার কথা।

একটু থামল নেগি। কি যেন ভাবল। মুহূর্তে তার সারা মুখে

ভেসে উঠল বিষাদের ছায়া। তারপর বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল, ডঃ কাসাবু, আমাদের পিতৃতুল্য কাসাবুকে ওরা খুন করেছে। আমাদের আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে ওরা লোপাট করেছে। ওদের ওপর জুলুম চালিয়ে বিজ্ঞানের বিরাট এক শক্তির অধিকারী হয়েছে এবং হতে চলেছে মাত্র একজন শয়তান। ভাবতে পার মিঃ বোস, কি এর পরিণাম হতে পারে? তোমাদের একজন নাবিক মরেছে, অথবা তোমাদের প্রাণহানি করার চেষ্টা করেছে, মনে রেখো এর জন্যে আমি তত ভাবছি না। আমার ভাবনা কি কারণে জান? বলেই পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করল নেগি।

দেখ। একবার চোখ বুলিয়ে দেখ। এসব খবর পৃথিবীর মানুষ জানে না। জানানো উচিতও নয়। আমরা কয়জন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেসন ছাড়া একথা কারুর কাছে ব্যাখ্যা করা হয় নি।

কাগজগুলি আমি পরীক্ষা করতে লাগলাম। এগুলি ডায়েরির পাতা। কাঁচা ইংরেজীতে নেগি লিখেছে। পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য এর কয়েকটি পাতার অবিকল অনুবাদ এখানে উল্লেখ করছি:

১। ৩০শে মার্চ। পেরুর কোন এক স্থানে আজ একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। ঠিক রাত আটটার সময় আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি উজ্জ্বল তারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ অত বড় তারা এর পূর্বে কেউ কোন দিন দেখে নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই অনেকে ঘাবড়ে যায়। তারাটি মুহূর্তের মধ্যে সোজা ঊর্ধ্ব আকাশে ছুটে আসতে থাকে এবং ক্রমেই তার আকার বাড়তে থাকে। কয়েক মিনিট পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আগুন জ্বলে ওঠে। পাঁচটি বড় গ্রাম এবং একটি বিরাট বন সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ হয়ত এই ঘটনাকে

একটি নিছক প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মনে করতে পারে। কিন্তু পরমাণু এবং মহাজাগতিক রশ্মি মিলিয়ে এটা যে একজন মানুষই সৃষ্টি করেছে, সে কথা শুধু আমরা কয়জনই জানি। কিন্তু শয়তানটার আসল উদ্দেশ্য কি ?

২। ২রা এপ্রিল। ব্রেজিলের কোন এক অঞ্চলে আজ অদ্ভুত আকৃতির কয়েকটি জন্তু দেখতে পাওয়া গেছে। স্থানটি গহন অরণ্যের মধ্যে। জন দশেক পেরুভিয়ান শিকারী একটি পার্বত্য নদীর ধারে কুমীর শিকার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হঠাৎ নদীর অপর পারে তারা ঐ জন্তুদের দেখতে পায়। দ্বিপদ প্রাণী বলে মনে হলেও, ওদের হাতগুলি ছিল অদ্ভুত লম্বা। সে তুলনায় পা অনেক খাটো। সমস্ত মিলিয়ে কতকটা শিম্পাঞ্জীর মত দেখতে। কিন্তু লম্বায় এক একটি প্রায় সাত ফুট। এরা দলবদ্ধ হয়ে শিকারীদের আক্রমণ করতে আসে। শিকারীরা এদের লক্ষ্য করে গুলিও করে। কিন্তু সমস্ত গুলিই ওদের দেহ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যায়।

৩। ৫ই এপ্রিল। কিন্তু সব চাইতে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে এই জ্যাকসনভিলেই। সংবাদপত্রে কিন্তু এ সংবাদ ছাপা হয়েছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যও কোন কোন কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। সারা জ্যাকসনভিলে আজ আত্মহত্যা করেছে তিন হাজার স্ত্রীপুরুষ। এদের অনেকেই শিক্ষিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ভোর হতে হতেই কেউ চলন্ত লরীর সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ রিভলবার দিয়ে নিজেকে গুলি করে, আবার কেউ রেলগাড়ী থেকে ঝাঁপ দেয়। ব্যাপারটা প্রথমটায় নিছক সাধারণ ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলেও ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেসনের অন্যতম প্রধান মিঃ এ্যালেকসি মুলার্ড বলেন, যে হারে সকলে আত্মহত্যা করে চলেছিল, তাতে তিন হাজার নয়— ওটা তিন লক্ষও হতে পারত। সময়মত আমরা হস্তক্ষেপ না করলে,

আমিও আজ বেঁচে থাকতাম না। সমস্ত ব্যাপারটার উপর মানুষের হাত আছে, শেষ পর্যন্ত এটাও আমরা আবিষ্কার করেছি। কিন্তু কে সে?

পড়তে পড়তে একবার চাইলাম নেগির দিকে। একটি সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিল সে। বললাম, সমস্ত জিনিসটাই আমার কাছে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

শুধু তোমার কাছে নয় মিঃ বোস, আমরা নিজেরাই কম হতভম্ব হয়নি, জেনো?

কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার মানে কি, মিঃ নেগি?

মানে জানতে চাও?—ক্ষোভে এবং দুঃখে যেন কাঁপতে লাগল নেগি।—এই নাও ডঃ কাসাবুর মন্তব্য। ছোট্ট একটি চিরকুট সে এগিয়ে দিল আমার দিকে। ডঃ কাসাবুর লেখা:

> পিয়ার্সন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে নতুন পৃথিবী, নতুন প্রাণিজগৎ সৃষ্টি করতে চলেছে। তার ধারণা, মানুষ এবার এগিয়ে যাচ্ছে পারমাণবিক যুগের দিকে। অথচ পারমাণবিক-পৃথিবীর মাঝখানে বাঁচতে গেলে প্রাণিজগতের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ আমরা তখন বাস করব সর্বনাশা বিকিরণের মধ্যে। আমাদের দেহের যে চামড়া—সেই সমস্ত বিকিরণের মধ্যে তা ঝলসে যাবে। অতএব জৈবিক পরিবর্তন চাই। তার জন্যেই সে পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।…

চিরকুটটি পড়ে চাইলাম নেগির দিকে।

কিছু বুঝলে?

না।

তবে শোন। ৩০শে মার্চে যে নক্ষত্রটি দেখা গিয়েছিল—তা সেই শয়তানের সৃষ্টি। কৃত্রিম উপায়ে সে প্রচণ্ড বিকিরণকারী একটি

পারমাণবিক পিণ্ড তৈরী করে আকাশে। উদ্দেশ্য নতুন কতকগুলি শিম্পাঞ্জীর ওপর পরীক্ষা চালান। অদ্ভুত। অদ্ভুত তার মেধা। প্রশংসা না করেও পারা যায় না। এই শিম্পাঞ্জীর দেহের ত্বকসুদ্ধ সে পালটে দিতে পেরেছে। যা পারমাণবিক বিকিরণকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু এর ফলে ওদের দেহের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে অনেক। ওদের গা থেকেই সেদিন ব্রেজিলে বন্দুকের গুলি ঠিকরে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু ৫ই এপ্রিলের দুর্ঘটনা?

তার ঐ পরীক্ষার ফলে জ্যাকসনভিলের বাতাস দূষিত হয়ে যায়। আর তা সেখানকার অধিবাসীদের মস্তিষ্ক বিকৃত করে তোলে। অনেকেই উন্মাদ হয়ে যায়।

সমস্ত শুনে আমিও এবার উন্মাদ হয়ে যাব, মিঃ নেগি। আমার কণ্ঠস্বরেও ভীতি।

নেগি কোন কথা বলল না। নীরবে আমার দিকে চেয়ে হাত-ঘড়িটা দেখে নিল একবার। তারপর আমাকে ইশারায় চুপ করতে বলে, মুহূর্তে জাহাজ থেকে সাগরের বুকে নেমে গেল। মনে হোল একটি ডুবো জাহাজে করে গোপনেই আমার সঙ্গে দেখা করতে সে এসেছিল। আবার গোপনেই গা ঢাকা দিল।

কিন্তু কেন? কেন সে এল, কি তার আসল বক্তব্য ছিল, কিছুই তো বলল না! লোকটাকে সত্যিই কেমন যেন রহস্যজনক বলে মনে হয়। আসলে ও যে কি, কি ওর স্বরূপ কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলের সঙ্গে দেখা করলাম আমি। তাঁকে জানালাম নেগির কথা, নেগির কাগজপত্রের কথা। আমাদের জাহাজের ডাক্তার স্ট্যানলিও সমস্ত ঘটনা শুনলেন। আর সমস্ত অফিসার যারা ছিল, তাদের কাছেও সব কিছু বিশ্লেষণ করা হোল। সেই সঙ্গে

জানানো হোল, যে অভিযানে আমরা চলেছি তার গুরুত্বের কথা ভেবে সকলেই যেন নিয়ম মাফিক কাজ করে যান।

পরদিন ভোর রাত্রে রেডিও মেসেজ এল মিঃ মুলার্ডের কাছ থেকে ঃ

হ্যালো! হ্যালো বোস! হ্যালো বোস! সর্বনাশ হয়েছে। তোমরা যেখানে জাহাজ নোঙর করে রেখেছ, এক্ষুণি সেখান থেকে অন্তত চার নট দূরে সরে যাও। কুইক। মাত্র এক ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে। এর বেশী সময় নিলে পৃথিবীতে কারও সাধ্য নেই, তোমাদের বাঁচায়।

কি বলতে চান, স্যার। রীতিমত ভড়কে গেলাম আমি।

এখন কথা নয়। লুজিয়ানার এ্যাটমিক অবজারভেটরি থেকে বলা হয়েছে আর এক ঘণ্টা পর তোমাদের জাহাজটা যেখানে রয়েছে সেখানে দারুণ কাণ্ড শুরু হবে। পারলে তোমরা আরও দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করো।

আর কথা নয়। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলকে জরুরী মেসেজের কথা জানিয়েই মাল্লাদের হুকুম দিলাম, নোঙর তোল। সে এক দারুণ ব্যাপার। ঘুম-জড়িত চোখে সকলেই আমরা ছুটাছুটি করতে লাগলাম এবং যত তাড়তাড়ি সম্ভব জাহাজকে যথাস্থানে সরিযে নিলাম।

বিশ্বাস কেউ করবে কিনা জানি না। ঠিক ভোর পাঁচটার সময় প্রায় ছয় নট দূর থেকে যে দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, শুধু আমরাই বা কেন, জ্যাকসনভিলের সকলেই। তা যে কি সাংঘাতিক সে কথা ভাবতে গেলেও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

হঠাৎ আমরা দেখলাম আকাশের এক জায়গায় একফালি সাদা মেঘ জমেছে। তার পরই প্রচণ্ড শব্দ এবং সেই মেঘের মধ্যে ফাটল ধরল পরক্ষণেই। অসীম আকাশ থেকে নেমে এল বেগুনী আলোর ছটা। একেবারে জলের ওপর। আমরা দূরবীন চোখে দেখতে লাগলাম,

যেখানে আমাদের জাহাজটা ছিল, সেখানে একটি মাছ ধরা নৌকার ওপর পড়ল সেই ছটা। আর দুইজন নাবিকসুদ্ধ সেই নৌকা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল চিৎকার করে উঠলেন, হায় ভগবন! এ আমি কি দেখলাম। আমাদের বুক ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

প্রায় দশ মিনিট ঐ বেগুনী ছটা স্থায়ী ছিল। তারপরই সব মিলিয়ে গেল।

কিন্তু ব্যাপার কি?

সেদিন বিকেলে বেতার-সংবাদে বার বার এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা হোল। ঘোষক আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, অজ্ঞাত কারণে মহাকাশ থেকে একটি অজানিত রশ্মি আজ মহাসাগরের বুকে নেমে আসে এবং প্রায় দশ মিনিট তা স্থায়ী হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এই রশ্মি যদি আজ শহরের উপর পড়ত, কি যে হোত তা ভাবাই যায় না।

আর সেদিন রাত্রে আবার এল নেগি। বলল, খুব বেঁচে গেছ তোমরা। এমন যে একটা কাণ্ড হতে পারে সে কথা তোমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার সময় আমার মাথায় গজায় নি। পরে অবশ্য সব কিছু লক্ষ্য করি। সঙ্গে সঙ্গে লুজিয়ানা এ্যাটমিক অবজারভেটরির সঙ্গে যোগাযোগ করি। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ওঁদের অনুরোধ করি রাত প্রায় দুটোর সময়। ওঁরা পরীক্ষা করে দেখেন, আমার কথাই ঠিক। তাই তো তোমরা বেঁচে গেলে।

এবার ক্যাপ্টেন এবং জাহাজের আরও অনেকের সঙ্গেই দেখা করল নেগি।

কিন্তু, কিছুই বুঝলাম না, নেগি! আসলে ব্যাপারটা কি? সব যেন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। আমার জিজ্ঞাসা।

ব্যাপার? ভাবার চেষ্টা করো না বোস, শুধু দেখে যাও। যে বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে সুখশান্তিতে ভরে দিয়েছে সেই বিজ্ঞানই ধীরে ধীরে কি ভাবে ধ্বংসের সূত্র বয়ে নিয়ে আসছে।

কতকটা বক্তৃতার ঢংএ বলতে লাগল নেগি—তুমি হয়ত জান, এই পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে গ্যাসীয় আচ্ছাদন। যেমন কমলালেবুর কোমল কোয়াকে কঠিন আঘাত থেকে বাঁচায় তার খোসা, ঠিক তেমনি মহাকাশের নানা রকম প্রাণঘাতী রশ্মির হাত থেকে পৃথিবীর মানুষকে বাঁচায় এই আচ্ছাদন। সেই শয়তান এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। তাই দিয়ে আকাশের খানিকটা স্থানের ঐ আচ্ছাদনে চিড় খাইয়ে দেয়। আর তার ফলে ঐ চিড়ের ফাঁক দিয়ে মহাজাগতিক রশ্মি এসে পড়ে সাগরের বুকে—ঠিক যেখানটায় তোমাদের জাহাজটা ছিল সেখানে। উদ্দেশ্য কি সে তো বুঝতেই পারছ। কি হোত, তা তো প্রত্যক্ষই করেছ। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সময়মত ব্যাপারটা আমরা ধরতে পেরেছিলাম।

আমরা মানে? ব্রিকহিল জিজ্ঞাসা করলেন।

সে কথা এখন বলব না, স্যার। আমার এই অক্ষমতার জন্য মাফ করবেন। এটুকু জেনে রাখুন, আমরা প্রত্যেকেই আপনার বন্ধু।

আর দাঁড়াল না সে।

নেগি চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই এল নির্দেশ। পুলিশ জানাল: আগামী কাল সকালেই আপনারা যাত্রা করুন। আপনারা ফ্লোরিডা উপসাগরের মধ্যে দিয়ে কি-ওয়েস্ট দ্বীপের পাশ বরাবর পড়ুন মেক্সিকো উপসাগরে। তার পর সোজা চলে যান পানামায়। সেখানেই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এক ডিভিসন সৈন্য আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে। দুটি ডেস্ট্রয়ারও সঙ্গে থাকবে।

আবার শুরু হোল যাত্রা। প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম অজানিত কোন আশঙ্কার। আর বার বার মনে পড়তে লাগল নেগির কথা। কি ওর সত্যিকারের পরিচয়। এত কথা সে জানে কি করে? এতবার যে ওর সঙ্গে কথা বললাম, ওর আসল পরিচয় কিন্তু তার ভেতর দিয়ে জানা গেল না।

স্কুইরেল নিয়মিত এগিয়ে যেতে লাগল। মেক্সিকো উপসাগরের মধ্য দিয়ে আমরা কত কথাই না ভেবে চলেছি। মাঝে মাঝে নতুন নতুন নির্দেশ আসে। কখনও নেগি, কখনও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফেডারেল ব্যুরো—সর্বদা নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে যাতে আমরা অগ্রসর হতে পারি তার জন্য উপদেশ দিতে লাগল। কয়েকদিন পর পৌছলাম ভেরাক্রুজ বন্দরে। মেক্সিকোর দক্ষিণ দিকের এদিকটা একটা অর্ধবৃত্তাকার তটরেখা নিয়ে আবার উঠে গেছে উত্তর বরাবর। বেশ গরমই মনে হোল আবহাওয়া। রীতিমত গ্রীষ্ম পড়ে গেছে। এরই মধ্যে সকলেরই মনে উদ্বেলতা, ভীতি এবং জয়ের আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু তখনও কি আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের সমস্ত অধ্যবসায়, চেষ্টা এবং বুদ্ধিকে হেয় প্রতিপন্ন করে আবার এক নতুন সমস্যার সম্মুখে শত্রুপক্ষ আমাদের ছুঁড়ে দেবে?

ভেরাক্রুজ বন্দর ছাড়ার তিন দিন পর। সোজা পানামার পথে পাড়ি দেবার জন্য সবে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি, ঠিক এমন সময়—হ্যাঁ আমাদের সমস্ত বুদ্ধি যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

তখন রাত ন'টা। রেডিও অপারেশন ক্যাবিনে বসে আমি এবং আমার সহকারী মিঃ গ্রে। একটি ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়ে আমাদের গন্তব্যপথ এবং সেই পথের যে যে স্থানে বিপদজ্ঞাপক নিশানাগুলি ছিল সেগুলি লক্ষ্য করছিলাম। সারাদিন প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায়

সকলেই আমরা ক্লান্ত ছিলাম। সন্ধ্যার পর সাগরের বুকের উপর নেমে এসেছিল মৃদু সমীরণ। এরই স্পর্শ পেয়ে নিজেদের বেশ জীবন্ত বলে বোধ হচ্ছিল। পরিষ্কার আকাশের চাঁদোয়ায় ফুটে উঠেছে লক্ষ তারার ভিড়। নিজেদের কাজের মধ্যে আমরা ডুবে গেছি।

ঠিক এমন সময় আমার ক্যাবিনের সমস্ত আলো গেল নিভে। চমকে উঠলাম আমি। অন্য কোন সময় হলে এতটা চমকে উঠতাম না। কারণ যান্ত্রিক গোলযোগে এমন একটা কিছু ঘটা তেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কার চিন্তা আমাদের এমন করে তুলেছিল যে, কোন কিছু দুর্ঘটনা হলেই আমরা তটস্থ হয়ে উঠতাম।

গ্রে'কে বললাম, দেখ, নতুন কি ফ্যাসাদ হোল আবার।

গ্রে আমার কথামত বাইরে ছুটে গেল। পরমুহূর্তেই ফিরে এল সে। বলল—দারুণ কাণ্ড। মিঃ বোস, এসব কি দেখছি?

বেচারা এত ভয় পেয়ে গেছে যে মুখ দিয়ে তার কোন কথাই বের হচ্ছে না।

কি ব্যাপার? আরে ছাই সেটাই আগে বলবে কি?—তার সমস্ত দেহ দুই হাতে শক্ত করে ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিলাম আমি।

মিরাকল! মিরাকল! মিঃ বোস।

গ্রে'র কথা শেষ হবার পূর্বেই ঝড়ের মত ক্যাবিনে এসে ঢুকলেন ডাঃ স্ট্যানলি, সহকারী মেরিন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গ্রাণ্ট এবং একজন লস্কর।

কি ব্যাপার ডাঃ স্ট্যানলি? মাথা আমার খারাপ হয়ে যাবে। একে ত সেই শয়তান ছদ্মবেশী বিল শহর দেখতে যাবার নাম করে ফ্লোরিডায় হাওয়া হোল। তারপর আর ফিরলও না। ফিরে যে আসবে না, নেগি সে কথা বলেছে। কথাটা ভাবতে ভাবতে নিজের উপরই যেন আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। তারপর এ আবার কি নতুন জঞ্জাল, বলুন তো?

কিছুই বুঝতে পারছি না, মিঃ বোস? অথচ—স্ট্যানলি কথা বলার চেষ্টা করলেন।

মিঃ গ্রান্ট উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কি বলছেন, স্যার? বলুন আমরা মরে গেছি। তাজ্জব। একেবারে তাজ্জব কাণ্ড। বাপের জন্মে এমন কাণ্ড—

বুঝলাম, প্রত্যেকেই খুব ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের আর স্থির রাখতে পারছে না। সঠিক উত্তর না পেয়ে আমিও তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। বললাম, যত সব অপদার্থ? কেন আলো নিভল, সে কথাটাও কি আপনারা মাথা ঠাণ্ডা করে বলতে পারেন না?

এই বলে, আর অপেক্ষা না করে ক্যাবিন থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ওরাও আমাকে অনুসরণ করল।

কিন্তু বাইরে এসেই চমকে উঠতে হোল। সমস্ত জাহাজ কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি টর্চ বের করে সুইচ টিপলাম। কিন্তু, হায় ভগবান! আমার টর্চটাও বিগড়াল নাকি? বার বার সুইচ টিপলাম। জ্বলল না। রাগে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম টর্চটা।

আপনাদের কারুর কাছেও কি একটি টর্চ নেই? দোহাই আপনাদের। যদি থাকে তো দয়া করে জ্বালুন।—ক্ষোভে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

সমস্বরে সকলে বলল, কারোর টর্চই জ্বলছে না, মিঃ বোস।

তার মানে?

ছুটে এলাম ইঞ্জিন-রুমে। আর অদ্ভুত বিস্ময়ে দেখলাম একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত ইঞ্জিন ঠিকমতই কাজ করে চলেছে।

মিঃ গ্রান্ট, তা হলে বলুন জেনারেটারও চলছে। জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

সেটা তো চলারই কথা, মিঃ বোস!

তা হলে?

দেখতে দেখতে মিনিট তিনেক কেটে গেল। এই আলো নিভে যাওয়ায় সকলেই আমরা এত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে যে একবার আমাদের উপস্থিত হওয়া উচিত সে কথা কারোর মনেই আসে নি। ডেকে, ইঞ্জিন-ঘরে, ক্যাবিনে মাল্লারা ছুটোছুটি করছে। কেরোসিনের সেফটি ল্যাম্প জ্বালানোর নির্দেশ দিয়ে সোজা ছুটতে লাগলাম আমরা ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে।

আর কোন রকমে হাতড়ে হাতড়ে যখন তাঁর ক্যাবিনের প্রায় কাছে এসে পড়েছি, ঠিক সেই সময় জাহাজের সমস্ত আলো হঠাৎ উঠল জ্বলে। দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠল চারদিকটা।

থমকে থেমে পড়লাম আমরা। এও কি কোন এক রসিকতা? অদ্ভুত ভৌতিক কাণ্ড?

কিন্তু যে সর্বনাশের কথা বার বার নেগি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং ফেডারেল ব্যুরো থেকে যাকে নিছক অমূলক বলে বড়াই করা হয়েছে স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিলাম সত্যিই তা ঘটতে পারে?

দুর দুর বুকে ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলের ক্যাবিনের মধ্যে এসেই গায়ের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল। আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ক্যাবিনটি ঠিক তেমনই রয়েছে। একেবারে নিখুঁত গোছান। অ্যাশ-ট্রের উপর রাখা একটি অর্ধজ্বলন্ত চুরুটের ধুঁয়ো তখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। শুধু ক্যাবিনের যে মালিক, সেই আমাদের প্রিয় ব্রিকহিল সেখানে নেই।

আমরা স্তম্ভিত! এবার সত্যি সত্যিই ভেঙ্গে পড়ব সকলে।

অপেক্ষা না করে সারা জাহাজ তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করলাম

আমরা। কোন লাভই হোল না। জাহাজের কোথাও ক্যাপ্টেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছুটে এলাম রেডিও অপারেশন রুমে। তাড়াতাড়ি যোগাযোগ স্থাপন করলাম ভেরাক্রুজ, কোলোন এবং পানামার সঙ্গে। জানালাম আমাদের দুর্ঘটনার কথা। জবাবে সকলেই বলল, ঘাবড়াবেন না। জাহাজটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি ঘটল? মেশিন চলছে, জেনারেটার চলছে, আরও সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়মিত কাজ করে চলছে, অথচ শুধু বৈদ্যুতিক আলোগুলিই কাজ করল না কেন? এমন কি টর্চও নিভে রইল—এর কারণ কি?

রেডিও অপারেশন ক্যাবিনে ডাঃ স্ট্যানলি, গ্রে এবং আমি স্থাণুর মত বসে রইলাম। আমার চোখ শুধু রেডিও সিগন্যালিং ডায়েলের উপর নিবদ্ধ।

কাটল আধ ঘণ্টা। রুদ্ধশ্বাসে। অবশেষে সিগন্যালিং ডায়েলে লালবাতি জ্বলে উঠল। রেডিও ফোনে কিছুক্ষণ ঘর ঘর শব্দ হোল। তারপরই কানে ভেসে এল ঃ হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। মেরিনার স্কুই। মেরিনার স্কুই। জিরো থ্রি ফাইভ স্পিকিং—জিরো থ্রি ফাইভ স্পিকিং—জিরো থ্রি—

ইয়েস। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সাড়া দিলাম আমি। এ যে নেগির সঙ্কেত। সেই রহস্যময় নেগি। মনে হোল মহাসাগরের মাঝখানে ডুবতে ডুবতে তবু একটি খড়কুটো পেলাম।

কথা বলতে লাগলাম আমি ঃ ইয়েস। স্পিকিং! মেরিনার স্কুই। থ্রি ডাবল জিরো সিকস। বোস।

বোস? লোপাট। আবার সেই শয়তানই জয়ী হয়েছে, বোস।

আমাদের সামান্য ভুলের মাশুল দিতে হোল বোধ হয় বিরাট খেশারত দিয়ে। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল এখন ওদের কব্জায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কি করে সম্ভব হল, বলবে কি ? কাঁপতে লাগল আমার কণ্ঠস্বর।

কেন ? আলো তো ওরা নিভিয়েই দিয়েছিল। তারপর আর কাজটা কঠিন কি বল ?

সে না হয় হোল, কিন্তু আলো নিভল কি করে ?

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিল নেগি। সে বলে যেতে লাগল—তা হলে শোন বোস। শয়তান পিয়ার্সনের এও এক অভিনব আবিষ্কার। তুমি নিশ্চয়ই জান, আলোর বাল্বের মধ্যে যে ফিলামেণ্ট বা সূক্ষ্ম তার থাকে, বিদ্যুৎশক্তি যখন তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে তখন সেই তার উত্তপ্ত হয়। শেষে অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে আলো দেয়। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, আসলে বিদ্যুৎশক্তিকে প্রথমে উত্তাপে, পরে আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত করা—এই যা। গত বৎসর লুজিয়ানা পারমাণবিক গবেষণাগারের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ জোসেফ এবিংহাউস একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কারের কথা বলেছেন। প্রকৃতিতে যে নিয়মিত বিদ্যুৎশক্তি ছড়িয়ে রয়েছে তাকে সংগ্রহ করার কাজে চিন্তা করেন ডঃ এবিংহাউস। এই আবিষ্কারের ফলে তিনি এমন একপ্রকার রশ্মি সৃষ্টি করেছেন যা কোন বিদ্যুৎশক্তি প্রবহমান পরিবাহীর উপর পড়লেই তার সমস্ত বিদ্যুৎশক্তিকে প্রশমিত করে দেয়। যদি বাল্বের মধ্যে এই অদৃশ্য রশ্মি প্রবেশ করে তা হলে ফিলামেণ্টের মধ্যে উপস্থিত বিদ্যুৎপ্রবাহকে এই রশ্মি শুষে ফেলে। ফলে বিদ্যুৎ থেকে তাপ—অবশেষে আলো—এর কিছুই ঘটে না।

তা হলে কি সেই রশ্মিই আমাদের বাল্বে প্রবেশ করেছিল ? প্রশ্ন করলাম আমি।

নিশ্চয় ! তোমাদের জাহাজের সমস্ত পরিবেশ এই রশ্মিতে ছেয়ে ফেলা হয়। সুখের বিষয় জীবদেহের উপর এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। নইলে তোমরাও সাবাড় হতে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব ? মানে সেই রশ্মি আমাদের জাহাজে নিক্ষেপ করা হোল কি করে ?

এটা একটি সমস্যাই নয়। সামান্য একটি ক্যাপস্যুলের মত আধারেই এর সমস্ত যন্ত্রপাতি থাকে। হয়ত কোন এক সময়ে তোমাদের অলক্ষ্যে ওরা একটি ক্যাপসুল জাহাজে রেখে দিয়েছিল।

কিন্তু এ তো ডঃ এবিংহাউসের আবিষ্কার। পিয়ার্সন তা জানল কি করে ?

হায় ভগবান ! আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। পিয়ার্সন যে এবিংহাউসকে লোপাট করেছে। শুধু কি তাঁকেই ? আরও কয়েকজনকেও। তোমাদের সেই ম্যাপটিও খোয়া গেছে।

তা হলে সমস্ত চেষ্টাই কি আমাদের ব্যর্থ হোল ?

না, তা হবে না। ওর নকল আমার কাছে আছে। যথাসময়ে তোমরা তা পাবে। আপাতত পানামায় তো আগে পৌঁছোও। ও. কে.। বায় বায় !

ডায়েলের সঙ্কেত-আলো নিভে গেল।

নেগির সমস্ত কথা ডঃ স্ট্যানলি এবং সকলকে বললাম। শোনা মাত্র তো তাঁরা ভয়ে সারা।

সকলের নির্দেশে অস্থায়ী ক্যাপ্টেন হিসেবে আমিই নিলাম জাহাজের দায়িত্ব। ভাবতে লাগলাম ব্রিকহিলের কথা। জানি না কোথায় এতক্ষণ তিনি রয়েছেন। হয়ত শত্রুদের হাতে কত লাঞ্ছনাই না জুটছে তাঁর। তবে সব চাইতে যে বস্তুটি আমাদের প্রত্যেকের মনেই গভীর রেখাপাত করে রেখেছিল তা হোল ঐ আলো নেভার ব্যাপারটা। সত্যিকথা

বলতে কি, এই ঘটনা আমাদের পাথর করে দিয়েছে। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতাও যেন আমাদের লোপ পেয়ে গেছে।

সাতদিন পর পৌঁছলাম পানামায়। এখানে মাত্র একদিন আমরা অপেক্ষা করলাম প্রস্তুতির জন্য। যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি ডেস্ট্রয়ার দিলেন আমাদের সাহায্যের জন্য। তবে কথা রইল আমাদের নির্দেশেই সেটা কাজ করবে। আধুনিক অস্ত্রাদি এবং প্রায় সাত'শ শিক্ষিত সৈন্য আমাদের সঙ্গে চলল। এদের পরিচালনার ভার রইল মেজর স্টিফেন্সনের উপর।

মেজর স্টিফেন্সন মাঝারি বয়সের ঝানু অফিসার। আমাদের জাহাজের একটি ক্যাবিনেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হোল। কিন্তু প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম, আমাদেরকে এড়িয়ে থাকতেই তিনি পছন্দ করেন। নেহাৎ কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা বলতে চান না। ডঃ স্ট্যানলি একসময়ে মন্তব্য করলেন, বেচারা মেজর। পুরো কর্ত্তাত্তি করতে পারছে না কিনা, তাই বোধ হয় মনে ক্ষোভ হয়েছে।

আমি বললাম, তা হলেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিন্তু সাহায্য করছেন খুব।

তা করবে না? পিয়ার্সন যে ওদেরও ভাবিয়ে তুলেছে। ওদের সমস্ত বড় বড় কারবারের উপর যদি কেউ টেক্কা মারে, সেটা কি সহ্য করা যায়?

অত দুঃখের মধ্যেও আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

পানামা থেকে যাত্রা পর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে কয়েক দিন আমরা অগ্রসর হলাম দশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ বরাবর সোজা পশ্চিম দিকে। তারপর একশ কুড়ি ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা

রেখার কাছে এসে সোজা দক্ষিণ দিকে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম।

দিগন্তহীন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভেসে চলেছে স্কুইরেল। প্রথম কয়দিন সাগর ছিল শান্ত—যেন স্বচ্ছ একটি সমতল কাচ পড়ে আছে ভূমিতে। কিন্তু কয়েক দিন পর মকরক্রান্তি রেখার কাছাকাছি এক জায়গায় প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখে পড়লাম আমরা। তবে সৌভাগ্যবশত কোন ক্ষয়ক্ষতি হোল না। পুরনো ম্যাপ দেখে আমি, মেজর স্টিফেন্সন এবং ডঃ স্ট্যানলি গন্তব্যপথ এবং আমাদের কার্যধারা ঠিক করলাম। এ ব্যাপারে আর একজনের সাহায্য পেলাম আমরা। সে হোল আমাদের জাহাজের ঝানু লস্কর মিঃ হকিন্স। বেচারা বুড়ো হলেও অসীম তার মনোবল। বুদ্ধিও প্রখর।

মাঝে মাঝে ব্রিকহিলের চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল। ব্রিকহিল বলতেন, বোস, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস জাহাজে থাকতে থাকতে নাবিকের কাছে মাটি যেন বড় পর হয়ে যায়। মনে হয় স্কুইরেল যেন আমার কত আপনার। আমি যেন এর হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাই। ইদানিং মেয়ের জন্যে বড়ই মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি। বেচারা ব্রিকহিল!

মকরক্রান্তিও অতিক্রম করলাম। আর যেদিন অতিক্রম করলাম ঠিক তার পরের দিন রাত্রে গ্রে ছুটে এল আমার কাছে।

কি ব্যাপার গ্রে? নতুন কোন সংবাদ? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

মিঃ বোস, আজ বিকেল পাঁচটার পর থেকে আমাদের বেতার যন্ত্রে একটি অদ্ভুত সঙ্কেত ভেসে আসছে। বলতে লাগল গ্রে—মাঝে মাঝে স্পষ্ট। তবে বেশীর ভাগই অস্পষ্ট। বেতার-তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক প্রায় পঞ্চাশ হাজার কিলো সাইকলস।

বুঝছ কিছু?

হ্যাঁ। বক্তার কোড : থ্রি জিরো জিরো। নাম বলছে এম। আর বার বারই বলছে : হেল্প! হেল্প!

সে কি? কে এই এম? তা হলে কি—?

নেগির কথা একবার মনে পড়ল। আর সমস্ত মন নতুন আশায় ভরে উঠল। আর অপেক্ষা না করে গ্রে'র সঙ্গে ছুটে এলাম বেতার-ক্যাবিনে।

বেতার-ক্যাবিনে ঢুকেই লক্ষ্য করলাম নির্দেশক আলোটি থরথর করে কাঁপছে। অপেক্ষা না করে ঝুঁকে পড়লাম গ্রাহক-যন্ত্রের উপর। দুই কানের ওপর হেড-ফোন দিলাম ঠেসে। আমার চারপাশে ব্যস্তসমস্ত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গ্রে, স্ট্যানলি, হকিন্স এবং গ্রান্ট।

হেড-ফোন কানে লাগাতেই এক করুণ চীৎকার-ধ্বনি কানে ভেসে এল। প্রথমে বক্তার কণ্ঠস্বর খুব ভালভাবে বোঝা গেল না। আকাশের অয়নমণ্ডলে চঞ্চলতা থাকলে যেমন কড়কড় শব্দ হয়—শুধু তাই-ই শোনা যেতে লাগল। প্রায় মিনিট পনের চেষ্টা করার পর বোঝা গেল সাংকেতিক ভাষায় বক্তা আমাদের সঙ্গেই কথা বলতে চায়।

আমি বললাম, ইয়েস। স্কুইরেলের অস্থায়ী ক্যাপ্টেন মিঃ বোস কথা বলছি।

মিঃ বোস? যেন কেঁদেই ফেলল বক্তা।

বলুন। আমি স্কুইরেল থেকে কথা বলছি।

আমি মিঃ এম.। আপনার কাছ থেকে দশ নট দূরে, ত্রিশ ডিগ্রী দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ডুবো পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করছি। অনাহারে এবং অনিদ্রায় তিন দিন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। নেগির কাছ থেকে আপনার যাবতীয় সংবাদ পেয়েছি। বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি। দোহাই আপনার—বাঁচান!

সংকেত কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট। মনের মধ্যে আমাদের বিরাট দ্বিধা। কে এই মিঃ এম, যে আমাদের সাহায্য চাইছে? অথচ নিজের পরিচয় তো পুরোপুরি দিচ্ছে না!

হকিন্স কিন্তু তাড়া দিল। বলল, জল্পনা-কল্পনা ছেড়ে কি ভাবে লোকটিকে সাহায্য করা যায় সেইটেই ভাবুন, স্যার। দরিয়ায় একটি লোক যখন হাবুডুবু খাচ্ছে তখন আঁক কষতে বসবেন না।

গ্রাণ্ট বলল, চট করে অমন হাবার মত কথা বলো না, হকিন্স। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। দেখছো বার বার আমরা বিপদের মুখে পড়ছি—

ইতিমধ্যে স্টিফেন্সনও এসে ক্যাবিনে হাজির হয়েছেন। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কি ব্যাপার?

তাঁকে সমস্তই বললাম।

হকিন্স বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে গ্রাণ্টের তাড়া খেয়ে। এবার সে বলে উঠল, আমার কি? একটা লোক বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছে, দরিয়ায় ডুবতে চলেছে—নাবিক হয়ে আমরা যদি তাকে সাহায্য না করি, ধর্মে সইবে?

বাজখাঁই গলায় উত্তর দিলেন স্টিফেন্সন, চুপ কর।

আমরা সকলেই তাঁর দিকে চাইলাম।

মিঃ স্টিফেন্সন আমার দিকে চেয়ে বললেন, পাগল হয়েছেন, মিঃ বোস? শত্রুপক্ষের এটা যে একটা চাল, যে কোন সুস্থমস্তিষ্ক লোকই তা বুঝতে পারে।

স্টিফেন্সনের এই অভদ্রজনোচিত মন্তব্যে আমি যেন মরিয়া হয়ে উঠলাম। কতকটা সামলে নিয়ে বললাম, তবু নাবিকের একটি নৈতিক কর্তব্য আছে, মিঃ স্টিফেন্সন। হকিন্স ঠিকই বলেছে।

ঝক্কিটা এতে করে কি বেশী নেওয়া হচ্ছে না, মিঃ বোস? মিঃ স্টিফেন্সনের কণ্ঠে উষ্মা।

একটু হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি বলুন? আসলে স্টিফেন্সনের কথাবার্তা যেন কেমন। গোড়া থেকেই ওঁর ভাবটা যেন আমরা ওঁর অধীনস্থ সাধারণ সেপাই। আর দ্বিধা না করে পাইলটকে নির্দেশ দিলাম, মিঃ এম-এর নিশানা ধরে জাহাজ চালাও।

ওদিকটায় সমুদ্রের স্রোত আমাদের অনুকূলে ছিল না। তাই হিসেবমত মিঃ এম বর্ণিত ডুবো পাহাড়ের কাছে আসতে আমাদের সময় লাগল কিছু বেশী। যদিও এই যাত্রার প্রতিমুহূর্তে মনের মধ্যে নানা দ্বিধা এবং ভয় ভীড় করে সবাইকে বেশ খানিকটা শঙ্কিত করে তুলেছিল তবু বলা চলে সেই ডুবো পাহাড়ের কাছে আসার পর সে ভাবটা আর রইল না।

রাত তখন গভীর। প্রায় তিনটে। আমি অবশ্য এখানে গ্রীনিচ মিন টাইমের কথাই বলছি। হকিন্স এগিয়ে গেল সার্চ লাইট নিয়ে চারপাশটা দেখে নিতে। গ্রান্ট তাকে নির্দেশ দিতে লাগল। ডঃ স্ট্যানলি এবং স্টিফেন্সন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন সমস্ত ব্যাপার। স্টিফেন্সন যে খুব খুশী নন তা ওঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

তুমি রেডিও অপারেশনের দায়িত্ব নাও। বললাম গ্রে'কে।

সুতীব্র আর্ক-ল্যাম্পের সন্ধানী আলো সেই অন্ধকার পরিবেশে যেন এক ভৌতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করল। আমরা অবাক বিস্ময়ে ক্ষণিক পরেই দেখলাম অদূরে যেন একটা পাথরের স্তূপ মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তারই এক প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে অতি ক্ষীণ একটি সাদা আলো। আলো জ্বলছে আর নিভছে।

হকিন্স চেঁচিয়ে উঠল, হায় ভগবান! দোহাই ধর্মাবতার, এ যে আমাদের পরিচিত সিগন্যাল!

পাগলের মত না চেঁচিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে আসল ব্যাপারটা কি সেটাই বল। বিরক্তি নিয়ে বললাম হকিন্সকে।

ততক্ষণে গ্রাণ্ট, স্ট্যানলি এবং স্টিফেন্সন, সকলেই এক জায়গায় হাজির হয়েছেন। স্ট্যানলি তো রীতিমত নাচতেই শুরু করলেন। বোধ হয় হকিন্সের মত তিনিও চীৎকার করে কিছু একটা বলতেন। কিন্তু আমার দিকে চোখ পড়ায় সাহস করে শব্দ করার চেষ্টা আর করলেন না।

স্টিফেন্সন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মনে রাখবেন মশায়রা, সমস্ত ঝক্কিটা কিন্তু আপনারাই নিচ্ছেন।

তার মানে? গ্রাণ্ট বেশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করে বসল।

মানে আর কি? সেয়ানার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। ঘোল আপনারাও বড় একটা কম খান নি। তাই বলছিলাম আর কি।

আপনি চুপ করুন মশায়। হকিন্স থামিয়ে দিল তাঁকেঃ জানেন না, তাই কথা বলছেন। এ নির্ঘাৎ মিঃ মিত্র। এই কোড অত্যন্ত গোপনীয়। একমাত্র আমাদের পুরনো লস্কর এবং এই ডাক্তার বাবু ছাড়া এর মানে কেউ ধরতে পারবে না। কি বলেন, ডঃ স্ট্যানলি?

তবু সমস্ত পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে হকিন্সকে বললাম, মিঃ মিত্রকে জানিয়ে দাও ভোর পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

বোঝা গেল, আমার কথায় হকিন্স খুব একটা খুশী হতে পারল না।

পরদিন ভোর হতেই জাহাজ থেকে একটি বোট নামিয়ে রওনা হলাম মিঃ মিত্রের সন্ধানে। অদ্ভুত চমক। রোমাঞ্চ। মিঃ ব্রিকহিল বার বার যাকে মৃত বলে স্বীকার করেছেন, তাকে কবর দেওয়া হয়েছে যে কথা লকসলি নিজ মুখে স্বীকার করেছেন—আজ তারই পুনরাবির্ভাব! ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

হকিন্স, গ্রাণ্ট এবং আমি রীতিমত সশস্ত্র হয়ে এগোতে লাগলাম

চারপাশের অনেকগুলি ডুবো পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে। কয়েকটি চূড়া পেরিয়ে এলাম সেই নির্দিষ্ট পাহাড়টায়।

আর সঙ্গে সঙ্গেই চমকের শুরু!

আমরা পাশে যেতেই একটা লোক সবেগে ধেয়ে এল। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। তামাটে গায়ের রঙ। আপাদমস্তক ছেঁড়া জামা-কাপড়ে ঢাকা। কাঁধে এবং হাতে নানা রকম যন্ত্রপাতি। রীতিমত উত্তেজিত ভাব। আমি তো ঘাবড়ে গিয়ে তাকে গুলিই করতে যাচ্ছিলাম এবং হকিন্স যদি ঠিকমত বাধা না দিত হয়ত করেই ফেলতাম।

পলকে নিরীক্ষণ করে চেঁচিয়ে উঠল হকিন্স, মি-ট্র! ও—ও মাই ডার্লিং মি-ট্র! আপনি বুঝতে পারছেন না, মিঃ বোস—ইয়েস। উই আর নট ফুলস। এই তো সে।

কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়বে মিঃ মিত্র। বিশেষ করে অমন পরিবেশে একজন স্বদেশবাসীকে পাওয়া সত্যই আনন্দের।

মিঃ মিত্র ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। ভুলে গেলাম পরিবেশ। ভুলে গেলাম কর্তব্যরত আমি একজন নাবিক। ভুলে গেলাম মিঃ মিত্র নামে কাউকে কবর দিয়েছিলেন ব্রিকহিল আর লকসলি। হতভম্বের মত গ্রাণ্ট আমাদের মিলন-দৃশ্য দেখতে লাগল।

কিন্তু তারপরেই আবার এক ফ্যাসাদ। হঠাৎ আমাদের জাহাজ থেকে বন্দুক ছোড়ার শব্দ ভেসে এল। তারপর একটি কামানও ফাটল। চমকে উঠলাম আমরা। ব্যাপার কি? জাহাজ কি আক্রান্ত হয়েছে? পরক্ষণেই দেখি আট-দশটি লাইফ বোট ঝপঝপ করে নেমে পড়ল ডেস্ট্রয়ার থেকে জলে। তার প্রত্যেকটিতেই পাঁচ-ছয় জন সৈনিক। মিঃ স্টিফেন্সনও তাদের মধ্যে। রাইফেল, স্টেনগান তাগ করা আমাদের দিকে। আর—কোন কিছু ভাবার আগেই ওরা এসে তীরে নামল। ঘিরে ফেলল আমাদের।

হ্যা-গু-স্ আপ !···হুকুমের স্বরে মিঃ মিত্রের দিকে তাচ্ছিল্য নিয়ে কথা বলল স্টিফেন্সন।

হকিন্স তাকে কি বলার চেষ্টা করতে গেল। তাকে থামিয়ে দিয়ে কড়া সুরে বলল স্টিফেন্সন, চুপ কর। দায়িত্ব আমারও বড় কম নয় এর জন্যে হেড কোয়ার্টার্সে আমাকেই জবাবদিহি হতে হবে।

তার মানে? রাগে কাঁপতে শুরু করেছি আমি।

দেখুন মশায়রা, বিশ্বাস আমি কাউকে করি না।···বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে কথা বলতে লাগল স্টিফেন্সন: বিশ্বাস করা আমাদের পেশাই নয়। আপনারা নেমে এলেই, আমরা সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে বললাম। আর যেই দেখলাম ঐ লোকটি হকিন্সকে তাড়া করে আসছে—না না, দূরবীনে এ সব দেখতে মোটেই আমার অসুবিধে হয় নি। আর যখন দেখলাম, মিঃ বোস, আপনি কোমরের পিস্তলটির উপর হাত রেখেছেন—

আমি একবার বাধা দেবার চেষ্টা করলাম।

স্টিফেন্সন থামলেন না, আরে মশায়, যখন দেখলাম লোকটি হকিন্সকে জড়িয়ে ধরেছে আর হকিন্সও বুড়ো হাড়ে বড় একটা পেরে উঠছে না—তখন আমিই তো ফাঁকা আওয়াজ করে জানিয়ে দিলাম—ভয় নেই। আমরা প্রস্তুত।

একটু সামলে কথা বলবেন মশায়, আমার গায়ে এখনও তাকত আছে। বুড়ো বলাতে রেগে গেছে হকিন্স।

আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে। হো হো করে হেসে উঠলাম: ফ্রেণ্ড! মিঃ স্টিফেন্সন, হি ইজ আওয়ার ফ্রেণ্ড।

ফ্রেণ্ড?

নিশ্চয়! সন্দেহ আছে নাকি?

হকিন্স বলল, মিত্র বড় ক্লান্ত। এখন জাহাজে চলুন মশায়। আপনার ফৌজি বুদ্ধির খুব বহর দেখা গেছে।

স্টিফেন্সন গম্ভীরমুখে আমাদের অনুসরণ করল।

স্টিফেন্সনের বোকামিটা পরে ফাঁস করে দিয়েছিল তাঁরই এক সৈনিক। লোকটির নাম বব।

বব হকিন্সকে বলল, জানেন না তো ওর স্বভাব। মাত্র মাস পাঁচ ছয়েক ও আমাদের কোম্পানিতে এসেছে। এরই মধ্যে আমাদের প্রাণান্ত-কর ব্যাপার। যত সব উদ্ভট কল্পনা ওর। নিজেকে মনে করে মস্ত এক বুদ্ধিদিগ্‌গজ। পৃথিবীতে কাউকে ও বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। দেখছেন না, গোড়া থেকেই আপনাদের ওপর কেমন ব্যবহার। আসলে মিঃ মিত্রকে ও একটা ভাঁওতা বলে মনে করেছিল। তাঁর সঙ্গে আপনাদের দেখা করাটাকে মনে করেছিল বিরাট একটা ঝক্কি। তাই জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আপনাদের ওপর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে থাকে। দূর থেকে যখন দেখে মিত্র এবং আপনি আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছেন, তখন ওর ধারণা হল, বুঝিবা মিত্র আপনাকে আক্রমণ করেছেন।

অদ্ভুত মগজ। সাবাস! এই নিয়ে বুঝি স্টিফেন্সন ফৌজের তদারকি করছে? হকিন্সের মন্তব্য।

আজ্ঞে, তাই তো সে অমন বাহার করে ছুটে গেল দরিয়ার মধ্যে আপনাদের রক্ষা করতে। নিরেট মশায়, যাকে বলে একেবারে গবেট। থু, থু! রেগেমেগে একগাদা থুতু ফেলল বব। সম্ভবত স্টিফেন্সনের উদ্দেশে। যাক, এসব কথা আর কানাকানি করবেন না, দাদা। জানেন তো ফৌজি আইন কাকে বলে?

আরে, না। পাগল হলে তুমি? মুরুব্বি চালে হাসল হকিন্স। বলল, লোকটাকে সামলে চলতে হবে দেখছি।

জাহাজে ফিরে আসার পর প্রথমে চলল মিলন-পর্ব। বৃদ্ধ স্ট্যানলি

মিঃ মিত্রকে ঠিক এই ভাবে দেখে তো কেঁদেই ফেললেন। লস্করর়া শুদ্ধ হতভম্ব হয়ে গেল। পুরনো পরিবেশের মধ্যে ফিরে এসে কয়েক ঘণ্টা কথাই বলতে পারল না মিঃ মিত্র। নিস্তব্ধ সাগরের বুকে এক হারিয়ে যাওয়া মানুষকে নিয়ে কত জল্পনাই না চলতে লাগল। আমাদের নাপিত ডিক এল তাকে কামাতে। নতুন এক প্রস্থ পোশাক দিয়ে তাকে সাজান হোল। তারপর চলল ভোজ-পর্ব। সেটাও চুকনো হলে তার কথা শোনার জন্যে উদগ্রীব আগ্রহে আমরা ক্যাবিনে এসে বসলাম। ততক্ষণ মনের অবসাদটা অনেকটা কাটিয়া উঠেছে মিঃ মিত্র।

স্ট্যানলি বলল, মোটেই তোমার আবির্ভাবে আমরা ঘাবড়াই নি, মিঃ মিত্র। নেগির কাছে ইদানীং সমস্ত কিছুই শুনতে পেয়েছি।

নেগি? ও—ঈশ্বর ওঁর মঙ্গল করুন। নেগি না থাকলে এভাবে ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গে ভোজ-পর্বে যোগ দেওয়া মোটেই সম্ভব হোত না, ডঃ স্ট্যানলি। আজ স্কুইরেল যে নিরাপদে এগিয়ে চলেছে, আপনাদের চারদিকে প্রাণঘাতী রশ্মি ছড়িয়ে, বিশেষ ধরনের বেতার-তরঙ্গ ছুঁড়ে আপনাদের বিপদের মুখে ফেলে সেই শয়তানটার —উঃ! ভাবতে পারি না আমি। নেগি—নেগি যে কত ভাল। বেচারা নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আজ শত্রুর কবলের দিকে ধেয়ে চলেছে।

দেখ বাপু, ওসব কথা পরে। আসলে সত্যিকথা বলতে কি, তোমাকে দেখে যেমন আমাদের আনন্দ লাগছে, তার সঙ্গে ভয়ও বড় কম পাচ্ছি না। আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি?…হকিন্স যেন কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছে না।

ইতিমধ্যে জাহাজ তার গন্তব্যপথে এগিয়ে চলেছে। গ্রাণ্ট আর গ্রে’কে এবং বিভিন্ন অফিসারদের নিয়মিত নির্দেশ দিয়ে মিত্রকে নিয়ে

বসলাম আমি, ডঃ স্ট্যানলি এবং হকিন্স। স্টিফেন্সনকেও নিমন্ত্রণ করলাম আমাদের এই অনুষ্ঠানে।

মিঃ মিত্র বলতে শুরু করল : আজও আমার পরিষ্কার মনে পড়ে সেই দিনটি, যে দিনে আমি নিহত হই। মানে ওরা আমাকে কবজায় পোরে। মিঃ লকসলি আমাকে যথেষ্ট মনোবল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কি যে হোল! তবে আমি বুঝতে পারছিলাম, আশ্চর্যজনক ভাবে কে যেন আমার কণ্ঠস্বর কেড়ে নিচ্ছিল। আমার দৈহিক শক্তি অদ্ভুত ভাবে কমে যাচ্ছিল। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। তারপর এক সময়ে আমি যে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাই—তাও যেন মনে পড়ে। তারপর কি হয়েছে জানি না।

হকিন্স বলল, হবে আর কি!

ডঃ স্ট্যানলি বললেন, তুমি অক্কা পেয়েছ। ব্যস! আমরা তোমাকে কবর দিয়ে চলে এলাম।

তা হতে পারে।···বলে যেতে লাগল মিত্র—তবে আমার যখন জ্ঞান হোল, দেখলাম ছোট্ট একটি ঘরে আমি বন্দী। ঘরটি খুবই আধুনিক কায়দায় সাজানো ছিল। ছিল বিদ্যুতের আলো আর কত রকম যে যন্ত্রপাতি! আমার মাথার কাছে একজন নার্স। মহিলা। নিজেকে খুবই দুর্বল মনে হচ্ছিল।

নার্সটির দিকে হতভম্বের মত চাইতেই মৃদু হাসল সে। বলল, কেমন মনে করছ? আসলে সে লরা। তখন তাকে আমি চিনতে পারি নি।

কিন্তু কি তাকে উত্তর দেব? মনে হচ্ছিল বুদ্ধিগুলি যেন জট পাকিয়ে গেছে। আমি করুণ নেত্রে শুধু তার দিকে চেয়ে রইলাম।

আর কোন কথা না বলে কি একটা কালো ধাতব পদার্থ আমার চোখের উপর লরা মেলে ধরল। প্রায় তিন ইঞ্চি ব্যাসের ঠুসির মত।

সঙ্গে জোড়া দুটি তার। পেছন থেকে বেরিয়ে প্লাগপয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত ছিল।···কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কি যে হোল? আমি চোখ বুজে ফেললাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। হাজারো হলদে, লাল, সবুজ প্রভৃতি আলো আমার চোখের ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। শরীর যেন কত হাল্কা। মাথাটা যেন ছুটে চলেছে আকাশের দিকে। আর তারপরই জ্ঞান হারাই।

ডঃ স্ট্যানলি প্রশ্ন করলেন, ঐ ধাতুর ঠুসির কোন পরিচয় সংগ্রহ করতে পেরেছ?

মানে, ঠুসি পরার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা, এ যে তাজ্জব ব্যাপার! হকিন্স কথা না বলে পারল না।

পেরেছি। তবে অনেক পরে। ওর নাম জেড-রশ্মি প্রক্ষেপক। অর্থাৎ ওর সাহায্যে মস্তিষ্কে জেড-রশ্মি নামে এক প্রকারের রশ্মি প্রবেশ করান হয়।

জেড-রশ্মি? এ আবার কি? আমরা তো একস-রশ্মি জানি, আলফা, বিটা, গামা, বড় জোর মেসন বা ঐ ধরনের রশ্মির উপর সম্প্রতি খুব গবেষণা চলছে তাও জানি। তাই বলে জেড-রশ্মি?

স্ট্যানলির ডাক্তারী মগজ ঠিক ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারে না।

মিত্র বলল, ঠিক তা নয়। শয়তান পিয়ার্সনের এ এক নতুন সৃষ্টি। তবে খুব যে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছি তাও বলা চলে না। এই রশ্মি মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি সারিয়ে তোলায় সাহায্য করে।

তার মানে? আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, মিঃ মিত্র?··· বললাম আমি।

পাগল! না, মিঃ বোস। বলুন সাময়িকভাবে ওরা আমার সত্যিই মৃত্যুই ঘটিয়েছিল। অর্থাৎ ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে মৃত বলে, আমি তাই-ই হয়েছিলাম। শুধু কি তাই? কবরের নীচে আমার মৃতদেহ

পড়েছিল সাত দিন। আর তারই পর! বিশ্বাস করুন, ডঃ পিয়ার্সন সাময়িকভাবে বিষক্রিয়া ঘটিয়ে আমার দেহের জৈবিক কাজগুলি বন্ধ করে দেয়। আমার মস্তিষ্কে একটি মস্ত বড় শক্ লাগে। আমার স্মৃতি লোপ পায়। আর তারপর অর্থাৎ সাময়িক ভাবে মৃত্যু ঘটিয়ে কয়েকদিন পর আবার সেই মৃতদেহে কি করে প্রাণ সঞ্চার করতে হয়—সে ঘটনা আমার জীবনেই আমি প্রত্যক্ষ করলাম।

তা হলে কি বলব ঐ ছোট্ট পিনই এর জন্যে দায়ী ?···বলল হকিন্স।

না তো কি ? ঐ সর্বনাশা পিন। ঐ পিনের মধ্যে ছিল মৃত্যুবীজ। কি ভাবে ছিল সে কথা শুনলে সমস্ত পৃথিবী আজ চমকে উঠবে। আপনারা ভাবছেন আমি পাগলের মত বকছি। কিন্তু সমস্তটা শুনলে বুঝবেন শুধু একটি মানুষের উপর আজ নির্ভর করছে পৃথিবীর মরণ-বাঁচন। আমি সেই শয়তান পিয়ার্সনের কথা বলছি, মিঃ বোস।

এক নাগাড়ে বলে যেতে লাগল মিঃ মিত্র—শুধু আমাকে নয়। চলুন সেই দ্বীপে। দেখবেন আমাদের থেকেও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি আজ পিয়ার্সনের হাতে বন্দী। ব্যাপারটা প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি। পিয়ার্সনের জেড-রশ্মির প্রভাবে ধীরে ধীরে আমার জ্ঞান ফিরে এল অর্থাৎ আমি জীবন পেলাম ফিরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার জীবনের পুরানো স্মৃতি বলতে যা, তা ভুলে গেলাম। এখানে যাদেরই বন্দী করে এনেছে পিয়ার্সন, সকলেরই এক অবস্থা। একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত সকলেই শয়তানটার কাজ করে চলেছে।

তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমাদের ক্যাপ্টেন মিঃ ব্রিকহিলের কন্যা লরার উপর কোন পরীক্ষা পিয়ার্সন চালায় নি। পরে শুনেছি, সেটা স্নেহবশত। কারণ পিয়ার্সনের একটিমাত্র কন্যা, ঠিক লরার মত দেখতে, কয়েক বৎসর পূর্বে একটি দুর্ঘটনায় মারা যায়। মাতৃহীন সেই মেয়েটি হারিয়ে বেশ বিমর্ষই ছিল সে। তারপর লরাকে পেয়ে সে

ভাবটা অনেক কেটে যায়। আর তার এই দুর্বলতাই তাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

লরা আমাকে আবিষ্কার করে সেই কক্ষে যে কক্ষে আমার চিকিৎসা করা হয়। লরা বুদ্ধিমতী। তাই আমার প্রতি কোন বিশেষ আগ্রহ সে প্রকাশ করে নি। তার ব্যবহারে পিয়ার্সনও তার উপর খুব নির্ভর করতে থাকে। আর শুধু তারই চেষ্টায় দীর্ঘকাল পর আমি বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সমর্থ হই। স্কুইরেল যখন জাঞ্জিবারে ছিল ঠিক সেই সময়েই কাসাবু নামে এক বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করা হয় স্কুইরেলকে ধ্বংস করার জন্যে। ভদ্রলোকের কোন হাত ছিল না। তাঁকে ওয়াশিংটন থেকে গোপনে বন্দী করে আনা হয় এবং পিয়ার্সন নিজে তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে তার মধ্যে রেখে দেয় অদ্ভুত সমস্ত যন্ত্রপাতি। আপনারা অবাক হবেন মিঃ বোস, সেই অদ্ভুত যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করত কাসাবুর বুদ্ধি, তাঁর কর্মক্ষমতা, অর্থাৎ কাসাবু কি ভাবেন, কি করেন, কি তাঁর করা উচিত—সমস্ত। পাছে কাসাবু বিশ্বাসঘাতকতা করেন তার জন্য সর্বদা প্রহরার ব্যবস্থা করা ছিল। কি ভাবে তিনি নিহত হয়েছেন হয়ত সে সংবাদও আপনারা রাখেন।

আমি বললাম, রাখি মানে? জাঞ্জিবারের সে অভিজ্ঞতার কথা জীবনে কোন দিনই ভুলতে পারব না, মিঃ মিত্র। শুধু কি তাই? আরও একজন নিগ্রোর মৃত্যু! উঃ! ভাবলেও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।··· হঠাৎ মনে পড়ে গেল জাহাজের রেডিও-অপারেশন রুমের সেই দুর্ঘটনার কথা। বললাম, জাঞ্জিবারের পথে একটি আলোর স্ফুলিঙ্গ—

ওঃ! হ্যাঁ।···মাঝপথে থামিয়ে বলল মিঃ মিত্র—ওটা একটি পারমাণবিক সংকেত। ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই জাহাজটি বিপথে চালানোর চেষ্টা করা হয়। ও থেকে নিয়ত একপ্রকারের পারমাণবিক রশ্মি কম্পাসের উপর নিক্ষেপ করে কম্পাসের কাঁটা সরিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু যে যন্ত্রটি ঐ দ্বীপ থেকে ঐ যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করছিল হঠাৎ তা বিকল হয়ে যাওয়ায় ওটি নষ্ট হয়ে যায়।

স্টিফেন্সন এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথাবার্তা লক্ষ্য করছিলেন। চুপ করে থাকলেও তাঁর হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল এ সমস্ত কথাবার্তা তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে নি। বরং মিঃ মিত্রের দীর্ঘ সংলাপ তাঁকে যেন বিরক্তিতেই ভরে তুলছিল। আর সেটা খুবই পরিষ্কার বোঝা গেল যখন তিনি বলে উঠলেন, সবই তো শুনলাম, মশায়। যা বললেন, তাতে বিগলিত হবার মত কিছু মনে হচ্ছে না।

কি বলতে চান আপনি, মিঃ স্টিফেন্সন ? কতকটা রাগতভাবেই জিজ্ঞেস করলাম আমি। সত্যি কথা বলতে কি স্টিফেন্সনের এমন ব্যবহারে সকলেই রীতিমত ক্ষুণ্ণ হলেন।

না, মানে, আমার প্রশ্নটা হোল, মিঃ মিত্র কি অনুগ্রহ করে বলবেন, কি ভাবে তিনি ঐ সর্বনেশে মানুষ পিয়ার্সনের হাত থেকে অত সহজে রেহাই পেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন ?

ব্যাপারটা খুবই জটিল।...বলতে লাগলেন মিঃ মিত্র—লরার সাহায্যে মিঃ লকসলির সঙ্গে দেখা করলাম আমি। বেচারা লকসলি, তাঁর মাথার আজ আর কোন ঠিক নেই। মিঃ ব্রিকহিলকে ওরা ধরে নিয়ে এসে বন্দী করেছে। পিয়ার্সন বুঝে নিয়েছে, যে ম্যাপটি ফেডারেল বুরো অব্ ইনভেসটিগেসনের হাত থেকে সে উদ্ধার করেছে সেটা জাল। তার বহু সাংকেতিক ভাষায় গোলমাল আছে।

বল কি মিত্র ? হকিন্স বাধা দিল। তবে যে পিয়ার্সন বলেছিল সে ম্যাপ তার হাতে এসে পড়েছে। বিলকে হত্যা করে তাদের চরকে নকল বিল সাজিয়ে সে ম্যাপটি লোপাট করেছে। আরও অনেক কথা—

সব বাজে। ভাঁওতা মেরে সে তোমাদের ঘাবড়ে দিতে চেয়েছিল।

আসলে এই দ্বীপের প্রকৃত নিশানাগুলি তার মধ্যে নেই। তাই যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে ব্রিকহিলকে।—হ্যাঁ, আজ নিজেকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করে আপনাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি তা শুধুমাত্র লরার চেষ্টায়। সে-ই আমাকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলে। একদিন সুযোগ করে নিয়ে আসে সমুদ্রের উপকূলে, যেখানে একদিন আমাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। এখানে এসে আমি যেন কেমন হয়ে পড়ি। মুহূর্তের মধ্যে মনে হোল আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা বুঝি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমি জ্ঞান হারাই। আর সেই ভাবেই ছিলাম প্রায় আধ ঘণ্টা।

এর পর আমার পুরানো স্মৃতি আবার ফিরে পেতে লাগলাম। মনে পড়ল স্কুইরেলের কথা, ব্রিকহিলের কথা, সকলের কথা।

পরে এক সময়ে লরা আসল ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বলে। আমাকে সারিয়ে তোলা হলেও পিয়ার্সন জানত না, লরা আমাকে সত্যিকারের পুরনো মানুষ করে তুলছে। অর্থাৎ আগে যা ছিলাম তাই। পিযার্সনের উদ্দেশ্য ছিল আমি আমার পুরনো স্মৃতি ভুলে গিয়ে সে যা চায় সেই ভাবে তাকে সাহায্য করি।

লরা তা চায় নি। লরার উদ্দেশ্য ছিল আমি আগের মতই হয়ে যাই। তার চেষ্টায় দেহ এবং মনে বেশ সবল হয়ে উঠলাম। কিন্তু তখনও তাকে আমি চেনার মত স্মৃতি পাই নি। এমন কি আগেকার কোন কথাই আমার মনে আসছিল না।

মনের যে জটটুকু এ পর্যন্ত আমার পুরনো স্মৃতি ফিরে পেতে বাধা দিচ্ছিল তা একেবারে ছিঁড়ে গেল যখন লরা যেখানে একদিন পিনের সাহায্যে পিয়ার্সন আমাকে খুন করেছিল, সেখানে আমাকে এনে হাজির করল।

ডঃ স্ট্যানলি বললেন, ঐ কবরের কথা বলছ তো ?

হ্যাঁ। পিনে মাখান সেই ভয়ঙ্কর রস একদিন আমার শিরা-

উপশিরার মধ্যে মিশে আমার সমস্ত স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে দিয়েছিল ঐ কবরেরই পাশে। ঐ কবরকে দেখে সেই হারানো স্মৃতি আমি পুরোপুরি ফিরে পেলাম।

তা মাঝে মাঝে হয় বৈকি। মন্তব্য করলেন ডঃ স্ট্যানলি। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যে ঘটনা স্মৃতিকে লুপ্ত করে, সেই ঘটনাকে আবার হুবহু ঘটাতে পারলে মানুষ আবার কখনও কখনও তার হারান মন ফিরে পায়। পুরনো সমস্ত কথা একে একে তার মনে পড়ে।

ঠিক তাই আমিও ফিরে পেলাম। বলল মিঃ মিত্র—তখন আমার কি যে আনন্দ, সে কথা আপনাদের আমি বোঝাতে পারব না।

লরা বলল, আনন্দের দিন পরে। এখন যা যা বলি, শোন, মিঃ মিত্র।

বল।

দেখতেই পাচ্ছ, বাবা এবং মিঃ লকসলি, উভয়েই পিয়ার্সনের হাতে বন্দী। এদিকে যে ম্যাপটি পিয়ার্সন পেয়েছে তাতে প্রচুর ভুল থাকায়, সে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। শুধু তাই নয়। আমেরিকার প্রখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী ডঃ এবিংহাউস এবং আমাদের পুরানো ডাক্তার হে—এঁদেরকেও পাকাড়াও করে এনেছে পিয়ার্সন। ডঃ হে সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়ায় জীবদেহের উপর পারমাণবিক রশ্মির প্রতিক্রিয়ার উপর একটি মৌলিক গবেষণা চালিয়ে দারুণ কৃতিত্বলাভ করেছেন। তিনি এমন একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা খেলে প্রচণ্ড পারমাণবিক বিকিরণও মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সুখের বিষয় পিয়ার্সন এঁদের বন্দী করে নিয়ে এলেও এঁদের উপর অনেকটা সে আজ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তবে কড়া পাহারার মধ্যে থাকায় এঁদের কাজ করারও অনেক অসুবিধে আছে। আমি কোন রকমে এঁদের সঙ্গে দেখা করেছি।

বল কি, লরা?

হ্যাঁ। অনেক সতর্কতা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। এখন আর মানুষকে ভয় করি না। ভয় যন্ত্র-মানুষকে।

যন্ত্র-মানুষ ? সে আবার কি ?

যারা তোমার চারপাশে কালো মুখোশ বা লোহার আস্তরণ পরে ঘুরে বেড়ায়, তাদের বেশীর ভাগই তো যন্ত্র-মানুষ। ঐ মুখোশ বা আস্তরণ খুললেই দেখবে, তার ভেতরে রয়েছে বহু বিচিত্র কলকব্জা। শয়তান পিয়ার্সন নিজে মাথা খেলিয়ে ওগুলি আবিষ্কার করেছে।

কিন্তু ওরা তো আমার সঙ্গে নিয়ত কথা বলে। আমি যা বলি তার ঠিক ঠিক জবাবও দেয়।

এ ব্যাপারটা খুবই সোজা, মিঃ মিত্র। আসলে যা তুমি বল ওদের ভেতরকার বেতার যন্ত্র তাকে এবং সেই সঙ্গে তোমার চেহারাকে টেলিভিসনের সাহায্যে পাঠিয়ে দেয় ওদের কনট্রোল রুমে। পৃথিবী এখনও টেলিভিসনের পরীক্ষায় খুব বেশী সফলকাম না হলেও পিয়ার্সন নিজে অদ্ভুত টেলিভিসন সেট তৈরী করেছে। —হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ঐ কনট্রোল রুমে আছে পিয়ার্সনের অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচর। ওরা তোমার চেহারা দেখে তোমার আবেগ বুঝতে পারে। কথার যা উত্তর বেতার মারফত ওরাই দেয়। আর ঐ যন্ত্র-মানুষের মধ্যেকার মাইক্রোফোনে সে কথা শুনতে পাও তুমি।

বল কি, লরা ? এ যে তাজ্জব ব্যাপার !

আরও অনেক তাজ্জব তুমি দেখবে, মিঃ মিত্র। ঐ কনট্রোলে আমাদের একজন বিশ্বস্ত বৈজ্ঞানিক আছেন। তাঁর নাম মিঃ নেগি।

নেগি ! আমরা প্রত্যেকেই চমকে উঠলাম।

হকিন্স বলল, নেগি, সেই রহস্যময় লোক, ডঃ কাসাবুর যে অনুরাগী ?

স্ট্যানলি যেন অবাক হয়ে গেছেন।

আমিও।

মিঃ মিত্র বলে যেতে লাগলেন, এই নেগির উপর সম্প্রতি স্কুইরেলকে ধ্বংস করার দায়িত্ব দেয় পিয়ার্সন। কারণ জাহাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে ওঁর অভিজ্ঞতা অনেক। কিন্তু তাঁর অধ্যাপক এবং স্বজাতি কাসাবুর উপর পিয়ার্সনের অত্যাচার নেগিকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। নেগির এখন একমাত্র চিন্তা কি করে পিয়ার্সনকে দমন করা যায়। পিয়ার্সনের খপ্পরে পড়ে তিনিও প্রথম দিকে পৃথিবীর অনেক ক্ষতি করেছিলেন। হয়ত অস্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, পেরু প্রভৃতি অঞ্চলের দুর্ঘটনার কথা আপনারা জানেন, মিঃ বোস।

জানি। সংক্ষেপে উত্তর দিলাম আমি।

ঐ দুর্ঘটনা ঘটেছে নানা জটিল পরীক্ষা চালাতে গিয়ে। পিয়ার্সন এখন পাগলের মত শুধু পরীক্ষাই চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সাহারার কোন গহন অঞ্চলে একটি জটিল পরীক্ষা চালানোর পরিকল্পনাও করেছিল। কিন্তু জাল ম্যাপে যে স্থানটিতে পরীক্ষা চালানোর কথা ছিল সে স্থানটি খুঁজে না পাওয়ায় দেরি হচ্ছে। নেগির উপর পড়েছে এই পরীক্ষার ভার।—এই পরীক্ষা চালানো হবে মাটির প্রায় দশ হাজার ফুট নিচে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটানো হবে এর জন্যে। নেগির আশঙ্কা, হয়ত এর জন্যে পৃথিবীর বুকে আটলান্টিকের গহ্বরে যে চিড় ধরে আছে সেটা আরও বেড়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত গোটা পৃথিবীটাই ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এরই মধ্যে স্কুইরেল সাড়া জাগিয়ে পিয়ার্সনের আস্তানার দিকে চলায় পরীক্ষা-কার্যটি আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

মাই গড্। স্টিফেন্সনের তখন হাঁ হওয়ার অবস্থা।

কি রকম মনে করছেন, মশায়? আপনার ফৌজি মগজে এসব কথা ঢুকছে তো? রসিকতা করার চেষ্টা করল হকিন্স।

হকিন্সের রসিকতায় প্রত্যেকেই আমরা হেসে উঠলাম। বেচারা স্টিফেন্সন!

অদ্ভুত! অদ্ভুত সে সমস্ত আবিষ্কার।···বলে যেতে লাগল মিঃ মিত্র। পিয়ার্সন নিজের চেষ্টায় যা আবিষ্কার করেছে তা যেমন বিস্ময়ের তেমন ভয়ঙ্করও। বিপদ? বিপদ এখনও কেটে যায় নি। নেগি পিয়ার্সনের চোখে ধুলো দিয়ে রাতদিন চেষ্টা করে চলেছে পিয়ার্সনের শয়তানীর জাল ধ্বংস করতে। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, একমাত্র নেগির চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে সেই প্রাণঘাতী দ্বীপ থেকে আমার পক্ষে সরে পড়া। সেই দ্বীপের ভয়ঙ্কর রেডিও টেলিস্কোপ, বিস্ময়কর রাডার—এ সমস্তের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তবে আসা। সেই দ্বীপের চারপাশে রয়েছে রেডিও ডিটেক্টার নামে এক প্রকারের যন্ত্র। ঐ যন্ত্র থেকে নিয়ত বের হয়ে চলেছে বিচিত্র এক রশ্মি। ফলে যে কোন জিনিস ঐ দ্বীপের কাছে থাক না কেন ঐ রশ্মি তার উপর গিয়ে পড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ফটোগ্রাফ ঐ যন্ত্র তুলে নিয়ে পাঠিয়ে দেবে রেডিও-অপারেটারের কাছে। সেখান থেকে সিগন্যাল যাবে অপারেশন রুমে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক প্রকারের রশ্মি তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে, পিয়ার্সন এই রশ্মি আবিষ্কার করেছে মহাজাগতিক রশ্মি থেকে।

বলেন কি মিঃ মিত্র? এবারে শঙ্কিত না হয়ে পারলাম না আমি! শুধু আমিই বা কেন—সকলেই।

অপারেশন রুম থেকে রশ্মি ফেলার কাজটা করে একটি যন্ত্র-মানুষ। লরা কোন মতে সাময়িক ভাবে তাকে বিকল করে দেয়। ফলে আমার ওপর তার কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটে নি। আর—বলে পকেটে হাত পুরে একটি ছোট্ট গোলাকার যন্ত্র বের করলে মিঃ মিত্র। আয়তন একটি কমলালেবুর মত। চারপাশে চারটে শক্ত স্প্রিং ঝুলছে। আর

তারই ডগায় মসুরি ডালের মত ছোট্ট চকচকে লাল রঙের কি যেন একটি বস্তু। গোলাকার যন্ত্রটির একপাশে একটি বোতাম টিপতেই ওগুলি জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল। কি তীব্র তার তেজ! পরক্ষণেই মিঃ মিত্র ওগুলিকে নিভিয়ে দিয়ে বলল—এই বস্তুটির জন্যই পিয়ার্সনের অদৃশ্য চোখের হাত থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি, মিঃ বোস। এর ভেতরে আছে ছোট ছোট ক্যাপসুল আকারের শক্তিসম্পন্ন তড়িৎ-কোষ আর যন্ত্র। যখন চলতে থাকবে তখন এর চার পাশে বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের এক প্রকার তরঙ্গ সৃষ্টি হবে। ঐ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে অন্তত এক মাইল পথ জুড়ে। আর ঐ এক মাইলের মধ্যে পিয়ার্সনের রেডিও-ডিটেক্টার কোন কাজই করতে পারবে না।

এত কাণ্ড? হকিন্স বিস্মিত।

ব্যাপারটা যথেষ্ট জটিল। ডঃ স্ট্যানলির যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ফন্দীবাজটাকে কি অত সহজে আমরা কায়দা করতে পারব?

মানে? স্টিফেন্সনও বেশ ঘাবড়ে গেছেন।

নেগিই তা হলে এখন একমাত্র ভরসা। কি বলেন, মিঃ মিত্র? বললাম আমি।

আপনাদের অত বেশী উতলা হওয়ার প্রয়োজন নেই, মশায়রা। মিত্র চাইল সকলের দিকে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, মাফ করবেন, মিঃ বোস। নেগির নির্দেশমত স্কুইরেলের যাত্রাপথকে আরও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। হাতে আমাদের সময় মাত্র তিন দিন। পিয়ার্সন এ সময়টায় ব্যস্ত রয়েছে। ডঃ হে এবং ডঃ এবিংহাউস গোপনে আমাদের সাহায্য করবেন। আমাদের এখন একমাত্র কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডেল্টা দ্বীপে পৌঁছানো।

ডেল্টা দ্বীপ?

মিঃ মিত্র আমার সম্মুখে ছোট্ট একটি ম্যাপ বিছিয়ে ধরল। আমরা তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। মিঃ মিত্র দেখাতে লাগল—এই হোল পিয়ার্সনের সেই ৪ নম্বর দ্বীপ। এর পশ্চিম দিকে ছয় মাইল দূরে এই যে দেখছেন এটাই হল ডেল্টা দ্বীপ। এই ডেল্টা দ্বীপের চারপাশে চারটে রক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে আল্‌ফা, বিটা, গামা এবং কাপ্পা দ্বীপ। এর সমস্তই পিয়ার্সনের অধিকারে। প্রতিটি দ্বীপই এক একটা বড় কার-খানা। তবে এই ডেল্টা দ্বীপেই রয়েছে জেনারেটার। এখান থেকে পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। আর সেই বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে সমস্ত যন্ত্রের কাজ চালায় পিয়ার্সন। এই দ্বীপটিকে আমাদের দখলে এনে ঐ জেনারেটারটিকে ধ্বংস করতে হবে।

সেদিন আর কোন কথা হোল না। মিঃ মিত্র তাঁর ক্যাবিনে বিশ্রাম করতে গেল এবং সেই সঙ্গে জানিয়ে গেল আগামী কাল সে তার পরিকল্পনার কথা সকলকে বলবে। সম্ভবত এর মধ্যে নেগির কাছ থেকেও একটা নির্দেশ আসতে পারে। স্ট্যানলি এবং হকিন্সও চলে গেল।

কিন্তু সেদিন রাত্রেই নেগির সিগন্যাল পেলাম। গ্রে জানাল, নেগি মিঃ মিত্রকে একটি কোড পাঠিয়েছে—থ্রি, নট সেভেন। ব্যাপারটা আমি যেন মিত্রকে বলি। অতএব বিশ্রাম আর হোল না। মিত্রকে জাগিয়ে নেগির কোডের কথা বললাম। মিঃ মিত্রের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আমার সঙ্গে আসুন মিঃ বোস, কুইক্। নেগি যে এত তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পারবেন, আশা করি নি।

মিঃ মিত্রের সঙ্গে আমি এলাম হকিন্সের ক্যাবিনে। সেখান থেকে হকিন্সকে নিয়ে এলাম জাহাজের প্রপেলারের কাছে। প্রপেলারটি যেখানে বসানো ছিল ঠিক তার উপর থেকে একটি কি যন্ত্র তুলে নিল

হকিন্সের সাহায্যে মিঃ মিত্র। দেখলাম ছোট্ট একটি বাক্স। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মত একটা গুন-গুন শব্দ বের হচ্ছে তা থেকে।

মিঃ মিত্র বলল, এই সেই যন্ত্র যার সাহায্যে আপনাদের জাহাজ যখন যেখানে থেকেছে তার সংবাদ পিয়ার্সন জানতে পেরেছে। পিয়ার্সন নিজে এই যন্ত্র আবিষ্কার করেছে—নাম অটোমেটিক ইলেক্‌ট্রোনিক জিওফিজিক্যাল ইণ্ডিকেটর। আপনি হয়ত জানেন মিঃ বোস, পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। সেই চুম্বকের বলরেখা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অবস্থান করছে। আর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে তা ছড়িয়ে রয়েছে। এই বলরেখার ছবি দেখে বলা যায় কোন্ স্থানের অবস্থানটি কোথায়।

কি রকম? হকিন্স ঠিক যেন বুঝতে পারছে না।

যেমন ধর কলকাতা। কলকাতার উপর বলরেখা বিশেষভাবে আছে ছড়িয়ে। এই যন্ত্রটি যদি কলকাতায় থাকে তা হলে নিয়ত এ কলকাতার বলরেখার ছবি তুলে পাঠাবে পিয়ার্সনের কাছে। ছবি দেখলেই পিয়ার্সন বুঝবে যন্ত্রটি কলকাতায় আছে। তার মানে যন্ত্রটি যার সঙ্গে লাগান, সেটিও তখন কলকাতায় রয়েছে। এই যন্ত্র গোপনে পিয়ার্সন এই জাহাজে রাখে তারই অনুচরের সাহায্যে। তাই জাহাজ যেখানে গেছে, যন্ত্রটিও সেখানে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানের চুম্বক বলরেখার ছবিও গেছে পিয়ার্সনের কাছে।—কিন্তু ব্যাখ্যা থাক। নেগি জানিয়েছে, এই যন্ত্রটিকে ঠিক করে রাখতে। এর মধ্যে আছে ফটো ইলেকট্রিক সেল। সূর্যরশ্মি থেকে এই সেল বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি করে যন্ত্রকে চালু রেখেছে।

মিঃ মিত্র এই যন্ত্রের উপরকার একটি কাঁটা একটি সুতো দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর হকিন্সকে বলল, যেখানে এটি ছিল সেখানে রেখে দাও।

কি ব্যাপার? বললাম আমি।

একটু হাসল মিঃ মিত্র—যন্ত্রটিকে নিয়ন্ত্রিত করলাম। এখন থেকে এ মাত্র এই জায়গাটিরই অবস্থান পিয়ার্সনকে পাঠাতে থাকবে। ফলে আমরা এবার থেকে যেখানেই যাই না কেন পিয়ার্সন জানবে জাহাজ এক স্থানেই রয়ে গেছে। নেগি জানিয়েছে, আর কোন আশঙ্কা নেই।

আর এর তিনদিন পরই এসে পৌঁছলাম ডেল্টা দ্বীপের কাছে। হাঁ করে চেয়ে রইলাম আমরা। আলফা, বিটা, গামা এবং কাপ্পা দ্বীপগুলিও লক্ষ্য করলাম। শয়তানের মত তারা নীরবে সাগরের বুকে বিরাজ করছে পৃথিবীর মানুষের সুখ এবং শান্তিকে কেড়ে নিতে।

মিঃ মিত্র বলল, আমাদের আক্রমণ শুরু হবে ঠিক রাত দশটায় মিঃ বোস।

আমি কি আর্মিকে সেই নির্দেশই দেব, মিঃ মিত্র? স্টিফেন্সন কথা বললেন এবার।

এখন না। যা করার আমি পরে বলব।

গম্ভীর হলেন মিঃ স্টিফেন্সন।

সমস্ত জাহাজে তখন শ্মশানের নীরবতা। এতদিন আমাদের প্রত্যেকের মনে ছিল দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। কি করে শয়তান পিয়ার্সনকে দমন করে আমাদের প্রিয়জনদের উদ্ধার করা যায় শুধু তাই। কিন্তু এই প্রথম একেবারে শত্রুপুরীর মধ্যে প্রবেশ করে আমরা বুঝলাম আমরা পঙ্গু হয়ে গেছি। সকলেই সকলের মুখের দিকে চেয়ে। অজানিত শঙ্কার ছায়া গভীর হয়ে নেমে এসেছে প্রত্যেকের মুখের উপর।

মিঃ মিত্র বলল, আপনাদের ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। নেগি ঠিক মতই কাজ করে গেছে। নইলে এখানে আসাই আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। সারাদিন এখানে এখন বিশ্রাম। কাজ শুরু করতে হবে রাত দশটায়।

তারপর মিঃ স্টিফেন্সনের দিকে চেয়ে বলল, মাপ করবেন, স্যার। কি ভাবে যে আমাদের আক্রমণ চালাতে হবে, আগে থেকে তার কিছুই বলতে পারব না। হয়ত আপনার মিলিটারি কায়দামত চলাও আমাদের পক্ষে এ সময় সম্ভব হবে না। তবু আমার একান্ত অনুরোধ, যা যা আমি বলব, আপনি যথাযথ সে ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন।

স্টিফেন্সন কথাটি শুনে যে খুব খুশি হলেন না তা তাঁর মুখের আদল দেখেই বোঝা গেল। কিন্তু আমাদের মুখের দিকে চেয়ে সম্ভবত প্রতিবাদ করার সাহস পেলেন না তিনি।

এরপর পুরো পাঁচ ঘণ্টা কি সব সাংকেতিক সংবাদ আদান-প্রদান হোল মিঃ মিত্রের সঙ্গে নেগির। আমি, মিঃ গ্রে এবং ·ডাক্তার স্ট্যানলি সারাক্ষণ বসে রইলাম তাঁর পাশে। একের পর এক নির্দেশ আসতে লাগল নেগির কাছ থেকে। নেগি এরই মধ্যে ডেল্টা দ্বীপের সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রগুলি বিকল করে দিয়েছে। ডাক্তার হে ও ডক্টর এবিংহাউসও নেগিকে সাহায্য করছেন।

ঠিক রাত নটা বেজে দশ মিনিটের সময় মিঃ মিত্রের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, এবারে আমি নিশ্চিন্ত মিঃ বোস, পৃথিবীর এগারটি বিভিন্ন স্থানে যে ঘাঁটিগুলি পিয়ার্সন নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্যে তৈরি করেছিল সেগুলি অকেজো করা সম্ভব হয়েছে। মিঃ নেগি এইমাত্র অস্ট্রেলিয়ার বোম্বালা পয়েন্ট, প্রশান্ত মহাসাগরের লিফু দ্বীপ, চিলির টেল্‌কা পয়েন্ট এবং ইউক্রেনের এক গোপন ঘাঁটি থেকে সংবাদ পেয়েছেন ডেল্টা দ্বীপের কোন প্রতিক্রিয়া সেই সমস্ত স্থানে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটাতে পারবে না। এখন শুধু অপেক্ষা সাহারার নিগার কলোনির জন্য।

কিন্তু পিয়ার্সনের আসল মতলবটাই বা কি? নেগি, ডঃ কাসাবু

এবং বিশেষ করে মিঃ মিত্র বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সমস্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে তাদের পুরোপুরি পরিষ্কার ভাবে আমরা যে কেউ বুঝতে পেরেছি, সে কথা কেউ বলতে পারব না। স্কুইরেলে কাজ নেবার পর গোড়া থেকেই লকসলি বা ব্রিকহিল কেউই আমাদের কাছে খোলাখুলি কিছু বলেন নি। মনে হয়, হয়ত তাঁরা সেটা চান নি। অথবা এমনও হতে পারে তাঁরা নিজেরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট অন্ধকারে ছিলেন।

গোড়ায় লকসলির কথায় মনে হয়েছিল ব্রিকহিলের একমাত্র কন্যা লরাকে উদ্ধার করাই ছিল এই অভিযানের লক্ষ্য। পরে মিঃ মিত্রের কাছ থেকে পাওয়া সাংকেতিক মানচিত্রের কথা শুনে মনে হয়েছিল মূল উদ্দেশ্য লরাকে উদ্ধার করা হলেও পিয়ার্সনের ব্যাপারে অন্যান্যরাও মাথা ঘামাচ্ছে। লোকচক্ষু থেকে বহুদূরে এক অজ্ঞাত দ্বীপে গা ঢাকা দিয়ে একের পর এক নানা ধরনের পরীক্ষা চালাচ্ছে পিয়ার্সন। এ খবর পৃথিবীর বড় বড় শক্তিশালী দেশ রাখে। অথচ তার চাতুরী ভেদ করে সমস্ত রহস্য উদঘাটন করতেও সরাসরি কেউ এগোতে কেন যে সাহস করছে না, সেটাও অনুমান করা কঠিন।

ইতিমধ্যে সত্যিই কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে যা উপেক্ষা করা চলে না। একে একে কয়েকজন নাম করা বিজ্ঞানীর মৃত্যু অথবা আকস্মিক ভাবে উধাও হয়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটে গেল তার সত্যিকারের ব্যাখ্যাও খুঁজে পান নি অনেকে। কেউ ভাবছেন এর সমস্তই প্রাকৃতিক ঘটনা অথবা অন্য কিছু। কিন্তু ডঃ কাসাবুর মৃত্যুর পর সমস্ত গোপন কথা সেই প্রথম ধরা পড়ল। ধরা পড়ল কী দারুণ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে পিয়ার্সন। তার একমাত্র লক্ষ্য বিজ্ঞান-ক্ষমতাকে পুরোপুরি হাতের মুঠোয় পুরে পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব ফলান। আর অদ্ভুত ভাবে সে যে সাফল্য অর্জন করেছে তার অভিজ্ঞতার কিছু কিছু তো আমরাই প্রত্যক্ষ করেছি।

ডঃ কাসাবুর মৃত্যুই নেগিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সে বুঝতে পারল এ পর্যন্ত পিয়ার্সনের জন্যে পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করে গেছেন তার একমাত্র লক্ষ্য, ধ্বংস। তাই জাঞ্জিবারের সেই ঘটনার পর সে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করে দাঁড়াল পিয়ার্সনের বিরুদ্ধে। এখন একমাত্র তার লক্ষ্য কি করে পিয়ার্সনকে খতম করা যায়।

মিঃ মিত্র বলল, নেগির ওপর পিয়ার্সনের বিশ্বাস অগাধ। জীব বিজ্ঞানের একজন সেরা ছাত্র সে। নানাভাবে সে পিয়ার্সনকে সাহায্যও করেছে। যে গাছের পাতার রস পিনে মাখিয়ে একদিন আমাকে মৃত প্রায় করা হয় সেটি সে-ই আবিষ্কার করেছিল। বিশ্বাস করে অনেক গোপন কথাই পিয়ার্সন তার কাছে প্রকাশ করেছে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে গুপ্ত ঘাঁটি স্থাপন করেছে পিয়ার্সন। তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও সে দিয়েছিল নেগির ওপর।

ঘাঁটি? সেটা আবার কি, মিঃ মিত্র? কথা বললেন স্টিফেন্সন।

না। ঘাঁটি মানে আপনারা যা বোঝেন তা নয়, মেজর। যুদ্ধের ঘাঁটি নয়। মিঃ মিত্র বলে যেতে লাগলেন। আসলে এগুলি গোপনে গবেষণার আড্ডা। কিছুদিন হল পিয়ার্সন মহাকাশ থেকে সরাসরি মহাজাগতিক রশ্মি সংগ্রহ করে পৃথিবীর অন্যান্য শক্তির অভাব মেটানর কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

কি রকম? ডঃ স্ট্যানলির জিজ্ঞাসা।

তার ধারণা, তেল কয়লা পুড়িয়ে আমরা পৃথিবীতে যে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করছি এ নেহাৎ বাজে খাটুনি। আর এই ভাবে চললে একদিন তো সমস্ত তেল কয়লা শেষ হয়ে যাবে। তখন? তাই পিয়ার্সন অভিনব ভাবে চেষ্টা করছে মহাকাশ থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরের যে সমস্ত নক্ষত্র নিয়ত বিচিত্র মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে তাদের সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করতে।

হো-য়াট ? এর পরিণতি কি হতে পারে সেই শয়তান গবেটটা কি সে কথা জানে ? স্ট্যানলির কণ্ঠে ক্ষোভ।

হাসল মিঃ মিত্র। বলল, জানে। সে জানে পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করে যখন সেই রশ্মি পৌঁছবে তখন অনেক বিপজ্জনক ব্যাপারই ঘটতে পারে। হয়ত সমস্ত মানুষ বিলুপ্ত হতে পারে। গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে—

তাহলে—?

সেই কারণেই তো ৪ নম্বর দ্বীপে তৈরি করেছে সে বিশেষ ধরনের আবহাওয়া। জন্তু জানোয়ারের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের এনজাইম ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের দেহের চামড়ার গঠন পালটে দেবার চেষ্টা করছে। সে চামড়া এমন ভাবে তৈরি হবে যাতে করে মহাজাগতিক রশ্মি তাকে ভেদ করতে না পারে।

পা—গল। উদ্ভট, আজগুবী সব কল্পনা! এবার হেসেই উঠলেন ডঃ স্ট্যানলি। গালগল্পের মত শোনাচ্ছে না কি? বলি প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সইয়ে সইয়ে কত সাবধানেই না জীবদেহের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে। যাকে ডারউইন সাহেব জৈবিক বিবর্তন বলে গেছেন, আর তা কিনা ঐ পাজীটা ঘটাতে চলেছে কয়েক দিনে ?

হকিন্স, স্টিফেন্সন, আমি এবং সকলেই হাঁ হয়ে মিঃ মিত্র এবং ডঃ স্ট্যানলির কথাবার্তা শুনছিলাম। এ যে তালগোল পাকানর মত অবস্থা রে বাবা।

কতকটা তাই বটে। নিজের চোখে কিছু কিছু না দেখলে আমার কাছেও তাই মনে হত, ডঃ স্ট্যানলি।

কেন ? ব্রেজিল না কোথায় সেবার কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত সংবাদ কাগজে বেরিয়েছিল, মিঃ বোস ? ঐ যে, কি বলে—হকিন্স কথা বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। পড়েছি বটে সংবাদ, নেগিও বলেছিল। বললাম আমি।

ও, তাহলে ব্রেজিলের ব্যাপারটা আপনারা জানেন? কতকটা কৌতূহলের সঙ্গেই যেন কথা বলল মিঃ মিত্র।

হ্যাঁ, নেগি বলেছিল কি যেন। আসলে নেগি তো খাপছাড়া ভাবে বহু কথাই মাঝে মাঝে বলেছে, তার ছাই সব কিছু কি বুঝেছি? আমার উত্তর।

নেগি ঠিকই বলেছিলেন। এটা পিয়ার্সনের সেই জীবদেহের চামড়া পালটানর পরীক্ষা। কথাটা লরা এবং আমি জানতাম। আসলে পিয়ার্সন এ ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে। চামড়া পালটেছে, কিন্তু শেষে, মানে শিম্পাজী নিয়ে পরীক্ষা চালায় পিয়ার্সন। খুব নামকরা কোন এক জৈব-রসায়নবিদ এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেন। ডঃ এবিংহাউস না কি নাম তাঁর—অনেকগুলি শিম্পাঞ্জীর দেহত্বকের গঠন। মহাজাগতিক রশ্মি প্রতিহত করার মত ক্ষমতাও পেয়েছে, কিন্তু ওরা যে শেষ পর্যন্ত দানবের মত হয়ে গেল। শিব গড়তে বাঁদর। পিয়ার্সন বলেছে অস্ট্রেলিয়ার একটি জায়গা থেকে এবং ক্রিমিয়া থেকে যে যন্ত্রগুলি মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ন্ত্রিত করে ডেল্টা আইল্যাণ্ডে পাঠাচ্ছিল তারা নাকি ঠিক মত কাজ করে নি। তাছাড়া একদিন ঐ দ্বীপ থেকে যে মানচিত্রটি আমি পাচার করেছিলাম লকসলির কাছে, যেটা পাবার জন্যে হন্যে হয়ে আপনাদের পেছনে পিয়ার্সন লেগে রয়েছে এবং যার সমস্ত রহস্য একমাত্র নেগিই আজ পৃথিবীর মানুষের কাছে ফাঁক করে তাকে পথে বসাতে বসেছেন—তারই মধ্যে আছে কতকগুলি গুপ্ত ঘাঁটির অবস্থানের ঠিকানা। ঐ সমস্ত জায়গায় আরও কিছু কিছু যন্ত্র পিয়ার্সন গোপনে বসিয়েছিল। অথচ এখন আর তাদের হদিস না পাওয়ায় তাদের কাজে লাগাতে পারছে না—

ও। ম্যাপটার ব্যাপার তাহলে এই। হকিন্স কথা বলল।

ঠিক তাই। এখন ওটা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। যদি কোন অঘটন

না ঘটে নেগি এরই মধ্যে ওঁদের সাহায্যে ঐ সমস্ত জায়গা খতম করে দিয়েছেন। বলল মিঃ মিত্র।

কিন্তু—। কি একটা কথা বলতে গেল হকিন্স।

মিঃ মিত্র বলল, দাঁড়াও হকিন্স। মেজর স্টিফেন্সনের প্রশ্নের উত্তর দিতে দাও। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সাহারার গর্ভে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যে গবেষণাটি চালাচ্ছিল পিয়ার্সন, সুযোগ একদিন সেখান থেকেই এল। নেগিকে ডেকে পিয়ার্সন বলল, সাহারার সমস্ত যন্ত্রপাতি পরিচালনার দায়িত্ব সে তাঁর ওপর দিয়েছে। তাঁকে এই উপলক্ষে কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে যেতে হবে। নেগি দেখলেন এই সুযোগ।

সাহারার পরীক্ষাটি আবার কিসের ওপর চলছিল ? আমার প্রশ্ন।

পাগলা পিয়ার্সনের এও এক খেয়াল। আপনারা সকলেই জানেন, পৃথিবী তার অক্ষের চারপাশে ঘুরে চলেছে প্রচণ্ড বেগে। বলে যেতে লাগল মিঃ মিত্র।— এই ঘোরার সময় প্রচণ্ড ভাবে সে কেঁপেও চলেছে। ওর বিশ্বাস মূল অভিকর্ষ শক্তির সঙ্গে এই কম্পনটি মিলিয়ে সে নাকি প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করতে পারবে।

লোকটা দেখছি একেবারে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ করে পাগল হয়ে না যায় ? হকিন্সের মন্তব্য।

ব্যাপারটা ঠিক তাই দাঁড়িয়েছে হকিন্স। মিঃ মিত্রের উত্তর। যাক, নেগি তখন মরিয়া। ডঃ কাসাবুর মৃত্যু তাঁকে আরও পাগল করে দিয়েছে। পিয়ার্সনকে তিনি সাবাড় করবেনই। এবারকার এই সুযোগটাকে সে ভগবানের আশীর্বাদের মত ধরে নিল। আর পিয়ার্সন তার চালে ভুল করল এই সময়েই। সে অতিমাত্রায় তাকে বিশ্বাস করে ফেলল। নেগি, লরা এবং আমাদের মধ্যে শলাপরামর্শ শেষ হল এর কয়েকদিনপরেই। পিয়ার্সনকে নেগি বোঝালেন, তাঁর সাহায্যের জন্যে আমাকে তিনি সঙ্গে নিতে চান। এতে কোন ঝক্কি নেই। বোঝালেন

পূর্ব পরিকল্পনা মত নিজেকে আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। মানে এবার থেকে তিনি যা ইচ্ছে তাই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবেন।

তোফা চাল মেরেছ ত? হকিন্সের মন্তব্য।

হ্যাঁ, চাল বৈকি। আর তাতে ইন্ধন যোগালেন ডঃ এবিংহাউস। পিয়ার্সন রাজী হয়ে গেল। অতএব এই সুযোগে নেগির সঙ্গে আমি বেপাত্তা হয়ে গেলাম।

কিন্তু জাঞ্জিবারে নেগির সঙ্গে তোমাকে তো দেখা যায় নি? ডঃ স্ট্যানলির প্রশ্ন।

না। নেগি একাই জাঞ্জিবারে এসেছিলেন। আমাকে সে লুকিয়ে রেখে আসেন গামা দ্বীপে। এখানে বসেই আমি আপনাদের জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকি। এখানে বসেই নেগির সঙ্গে আমি বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে থাকি। আর সেই সঙ্গে স্কুইরেল যাতে ঠিকমত তার কাজ করে যেতে পারে তার ওপর নজর রাখতে থাকি।

তাহলে ব্রিকহিলের ব্যাপারটা, মানে তাঁকে চুরি করে নেয়ার ব্যাপারটা কি ভাবে সম্ভব হল? হকিন্সের প্রশ্ন সরল।

ক্যাপটেনকে পিয়ার্সন চুরি করে নিয়ে আসবে এটা আমরা কেউ ভাবি নি। অবশ্য নেগি শেষের দিকে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আর তাঁর কোন হাত ছিল না। তাছাড়া পিয়ার্সনকে সায়েস্তা করার ব্যাপারে তখন তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করায় ব্যস্ত ছিলেন। নেগিই তো কমিশনার এনভিলকে সমস্ত কিছু জানাতে সাহায্য করেন? আসলে খুবই সতর্কতার সঙ্গে আমাদের কাজকর্ম চালাতে হচ্ছিল কিনা? লোকটা তো কম ধুরন্ধর নয়?

লকসলি যখন সেখানে যায় তখন তুমি কোথায় ছিলে, মিঃ মিত্র? ডঃ স্ট্যানলির জিজ্ঞাসা।

ঐ একই গামা দ্বীপে। লরার কাছেই খবরটা পাই। কিন্তু ওকে সাহায্য করার ক্ষমতা আমাদের কারুরই ছিল না। বলল মিঃ মিত্র। —অবশেষে এই গামা দ্বীপ থেকেই একটি দাঁড়ে টানা নৌকয় করে আমাকে গা ঢাকা দিয়ে চলে আসতে হয় স্কুইরেলের উদ্দেশে। এসে অবস্থান করতে লাগলাম সেই ঘাড় উঁচু করা দ্বীপে যেখান থেকে আপনারা আমাকে উদ্ধার করেছেন। উঃ। সে কি দারুণ অবস্থা। ছোট্ট দ্বীপ। নৌকটি ভুস করে গেল ডুবে। জোয়ারের সময় দ্বীপটিও প্রায় একগলা জলের নীচে তলিয়ে যেত। সেখানেই আমাকে কাটাতে হয় প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা। তবু বরাত ভাল, বেতারে নেগির সঙ্গে যাহোক করে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সাবাস! আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, মশায়। স্টিফেন্সন বেশ মুরুব্বির মত কথা বলল।

ধন্যবাদ মেজর। বলল মিঃ মিত্র।

কিন্তু লকসলি? তিনি সেখানে এখন কি করছেন? আমার প্রশ্ন।

একটু যেন বিমর্ষ হল মিঃ মিত্র। বলল, জানি না। তবে তিনি যদি এখনও পাগল হয়ে না গিয়ে থাকেন, অল্পদিনের মধ্যেই হবেন। পিয়ার্সন তাঁর ওপর ব্রেন-হরমোন পরীক্ষা চালাচ্ছে।

সে আবার কি বস্তু? ডঃ স্ট্যানলির কৌতূহল।

তাত জানি না। লরা শুধু বলেছিল, ব্রেন-হরমোন পরীক্ষা চালিয়ে পিয়ার্সন নাকি একজনের মগজের চিন্তা আর একজনের মগজের মধ্যে পুরে দিতে পারবে।

তার মানে—?

মানে আর কি? লকসলিকে এখন সে ব্রিকহিল বানাতে চায়। ব্রিকহিলের পুরো মনের ছবিটা ওর মগজে পুরে দিতে চায়।

এতে লাভ? আমার প্রশ্ন।

লাভ? তখন ব্রিকহিলের মত আচরণ করবে লকসলি। কথা বলবে, গলার আওয়াজও হবে ব্রিকহিলের মত? আর এই নকল ব্রিকহিল, মানে লকসলিকে ডেল্টা দ্বীপে পাঠিয়ে নেগিকে একটু নাচাতে চায় যাতে নেগি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। সেই অবসরেই কাজ সারার মতলব আর কি? পিয়ার্সন বুঝে নিয়েছে নেগিই এখন তার একমাত্র বড় শত্রু। কিন্তু মনে হয় লকসলি অতটা ধকল সামলাতে পারবে না।

আমরা নীরবে মিঃ মিত্রের কথাগুলি শুনলাম। সমস্ত কিছু সম্পূর্ণ অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্যই মনে হোল। আর মিঃ মিত্রও বোধ হয় তা বুঝল। সম্ভবত সেই কারণেই সে বলল, ডেল্টা দ্বীপ থেকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক রশ্মির উপর মিঃ পিয়ার্সন গবেষণা চালাচ্ছে তার সমস্ত প্রাণকেন্দ্র ঐ স্থানে। পাছে আমাদের আক্রমণে বিহ্বল হয়ে সে নিজেই কোন অঘটন ঘটায় তাই এ ব্যবস্থা। নেগি আশঙ্কা করেছিল হয়ত প্রতিহিংসা বশত পিয়ার্সন এই ঘাঁটিগুলি থেকে পৃথিবীর বুকে ধ্বংসের ঝড় বহাতে পারে। তাই আগে থেকেই ঐগুলিকে নেগি অকেজো করে দিয়েছে।

ঠিক রাত নটা বেজে চল্লিশ মিনিটের সময় এল শেষ সংবাদ। সংকেতে নেগি জানাল, ও. কে.। সাহারার ব্যাপারও ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক দশটায় আপনারা অগ্রসর হোন। অর্থাৎ সাহারা থেকে যে যন্ত্রটি ডেল্টা দ্বীপের কতকগুলি যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করত তা খতম করা হয়েছে বোঝা গেল।

আর সমস্ত করণীয় কর্তব্যের কথাও সে জানাল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা তৎপর হয়ে উঠলাম। মিঃ মিত্র স্টিফেন্সনকে সঙ্গে আসতে বলল এবং স্কুইরেল এবং আমেরিকা সরকারের ডেস্ট্রয়ারকে আলফা দ্বীপের তিন মাইল উত্তরে অবস্থান করতে বলল।

যে নতুন দলটি সরাসরি ডেল্টা দ্বীপে অবতরণ করবে তার মধ্যে রইল মিঃ মিত্র, হকিন্স, ডাক্তার স্ট্যানলি, মিঃ স্টিফেন্সন। মিঃ মিত্র আমাকেও ছাড়ল না।

ন'টা পঞ্চাশে স্কুইরেল এবং ক্রুজারটিকে বিদায় দেওয়া হোল। বিভিন্ন অফিসারকে কখন কি করতে হবে সে নির্দেশও দিলেন স্টিফেন্সন।

আর ঠিক রাত দশটা যখন বাজল, অদূরে সেই ভয়াবহ ডেল্টা দ্বীপের তটরেখা থেকে ভেসে এল একটি তীব্র লাল আলোর সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে একটি মোটর বোটে আমরা এগিয়ে গেলাম ডেল্টা দ্বীপের দিকে। পাছে শব্দ হয় সে কারণে মোটর ইঞ্জিন না চালিয়ে আমরা দাঁড় বেয়ে এগোতে লাগলাম। দশ মিনিটের মধ্যেই একটি বিরাট পাথরের আড়ালে আমাদের বোটটিকে এনে দাঁড় করাল মিঃ মিত্র। সেখানেও একটি ছোট্ট লাল বাতি জ্বলছিল আর নিভছিল। এবার তা নিভে গেল।

প্রথমে পাড়ে নামল মিঃ মিত্র। তার পেছনে আমরা। সকলের সঙ্গেই আত্মরক্ষার জন্য কিছু না কিছু অস্ত্র নেওয়া হল।

প্রায় একশ' ফুট এগনোর পর একটি গুহার সম্মুখে উপস্থিত হলাম আমরা। গুহার মুখের কাছে উপস্থিত হতেই একটি গমগম শব্দ আমাদের কানে ভেসে এল। মিঃ মিত্র পকেট থেকে একটি ম্যাপ বের করল। হাতের পেন্সিল টর্চ বুলিয়ে দেখল সেটা। ম্যাপটি আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছিল সে।

এখান থেকে একশ' গজ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মাটির নীচে রয়েছে সেই জেনারেটারটা। তারই শব্দ শুনছেন আপনারা।—বলল মিঃ মিত্র।

তারপর আবার আমরা এগোতে লাগলাম। প্রায় পনের মিনিট হাঁটার পর উপস্থিত হলাম একটি কক্ষে। ঘরটি ফ্লুরেসেণ্ট আলোয় আলোকিত।

মিঃ মিত্র বলল, এই হোল এক নম্বর সেট। এর পরে আরও একটি কক্ষে আমাদের যেতে হবে।

হঠাৎ মিত্রের এই কণ্ঠস্বরে যেন আমাদের শিরা-উপশিরায় এক প্রচণ্ড শিহরণ খেলে গেল। আসলে প্রত্যেকেই যে আমরা রীতিমত ভয় পেয়েছি সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু অন্য কক্ষে যাওয়ার রাস্তা কোথায়? কোন দরজা তো দেখছি না? মিঃ মিত্র পকেটে হাত পুরে আর একটি নকসা বের করল। তারপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল পথের নিশানা।

কিন্তু হায় ভগবান! তখনও কি জানতাম আমাদের এত চেষ্টা, এত তৎপরতা, এত পরিকল্পনা, এ সমস্তই প্রায় বৃথা হবার মত অবস্থা? অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে যখন আমরা প্রায় হিম হয়ে গেছি ঠিক এমন সময় উঠল একটা মৃদু গুঞ্জন! আর ঠিক তারপরই ঘটল সেই অদ্ভুত কাণ্ড!

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিক তার সম্মুখের মেঝের কিছুটা অংশে চিড় ধরল এবং তা মুহূর্তের মধ্যে নিচে নেমে গেল। পরক্ষণেই সেখান থেকে জেগে উঠল একটি মূর্তি। কি অদ্ভুত চেহারা তার! আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা। মাথায় বিচিত্র একটি লোহার টুপি। ঠিক তার উপর একটি সবুজ আলো জ্বলছে আর নিভছে। হাতে দস্তানা। মুখও ঢাকা।

মিঃ মিত্র, মিঃ বোস এবং সকলে, মাথার উপর আপনারা হাত তুলে দাঁড়ান। গম্ভীরকণ্ঠে কথা বলল মূর্তিটি।

মুহূর্তে সমস্ত শরীর বুঝি অবশ হয়ে যাবে। তবু স্টিফেন্সন তারই মাঝে একবার পেছনে ছোটার চেষ্টা করলেন এবং কিসের আঘাতে ছিটকে পড়ে গেলেন সম্মুখে। চাইতেই দেখি ঠিক ঐ রকমের দশটি মূর্তি পেছনে দাঁড়িয়ে। আর কোন কিছু ভাবার আগেই তারা এসে জড়িয়ে ধরল আমাদের।

হতচেতন, বিহ্বল আমরা। হকিন্স তো ভয়ে কেঁদেই ফেলল। স্টিফেন্সন দিশেহারা।—আমি জানি—এ জানতাম, এমন একটি ফাঁদে আমরা পড়ব। বলতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব ? নেগির কাছ থেকে শেষ যে সিগন্যাল এসেছে তাতে তো সে বলেছিল, পিয়ার্সন আর রেডিও ট্রান্সমিটারে কাজ করতে পারবে না ? দু একজন প্রহরী হয়ত থাকতে পারে। এমন ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলির তো আসার কথা ছিল না ?

আর সব চাইতে আশ্চর্যের কথা, আমরা সশস্ত্র হলেও শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে কোন কথা বলব, এমন কি হাতের রিভলভারটি যে ব্যবহার করব, সে ক্ষমতাও যেন কে কেড়ে নিয়েছে ! অদ্ভুত ! অদ্ভুত ঐ আলো—যেন জ্বলন্ত বিভীষিকা ! ওর তীক্ষ্ণ রশ্মি যখন চোখের ওপর পড়ে, মনে হয় নিজের সমস্ত ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হয় আমরা পাগল হয়ে যাব। আমাদের দেহ অবশ পাথর হয়ে পড়বে।

তা হলে কি ঐ-ই জেড-রশ্মি ? অথচ মেঝের নিচ থেকে যখন ঐ মূর্তিগুলি উপরে উঠে আসছিল তখন আমাদের তো যথেষ্ট সুযোগ ছিল। সবুজ আলো সুদ্ধ ঐ মাথাগুলি কি উড়িয়ে দেওয়া যেত না ?

আমাদের নিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল একটি দেওয়ালের সামনে। লক্ষ্য করলাম, একজনের মাথার উপর একটি লাল বাল্ব জ্বলে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের মাঝখানে একটি অংশ সরে গিয়ে দরজা সৃষ্টি হোল। আমরা এলাম দ্বিতীয় কক্ষে। মুহূর্তের মধ্যে কক্ষটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হোল। অদ্ভুত ব্যাপার এই—এই ঘরটিতে কোন আলোর বাল্ব দেখিনি। অথচ কোথা থেকে যে অত আলোর ফোয়ারা এসে ঘরটিকে দিনের মত স্পষ্ট করে রেখেছিল কে জানে ? আমরা অনুভব করলাম মূর্তিগুলি

আমাদের হাত ছেড়ে দিল। কয়েক সেকেণ্ড—তারপর আবার সেই উজ্জ্বল আলোর ফোয়ারা। আর ওরা? সেই ভয়াবহ মূর্তিগুলি? সমস্ত ঘরের কোথাও কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই তাদের।

লক্ষ্য করলাম এই কক্ষটি কালো ইস্পাতে মোড়া। সমস্ত সিলিং জুড়ে অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র। বিচিত্র তারের জাল বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে টাঙানো। কতকগুলি ডেস্ক। তার ওপর হাড়ের স্তূপ। কয়েকটা কাচের জার। তাদের মধ্যে মানুষের বিকৃত মূর্তি। শিউরে উঠলাম আমরা। তা হলে এই কি হবে আমাদের শেষ পরিণতি? মিঃ হকিন্স ভয়ে কাঁপছে। স্টিফেন্সনের তো মূর্ছা যাবার মত অবস্থা। তবে ডাক্তার স্ট্যানলিকে শক্ত লোক বলতে হবে। তিনি বললেন, মশায়রা, বিপদ আমাদের মাথার ওপর, একথা ঠিক। তবু, মিঃ স্টিফেন্সন, আপনি একজন ঝানু সৈনিক। বুঝেছি, মৃত্যুর মুখে আমরা দাঁড়িয়ে। যুদ্ধে এর চাইতেও নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যে আপনাকে পড়তে হয়। আপনি যদি এ সময়ে ভেঙ্গে পড়েন—

না মশায়, সেখানে তবু কিছুটা বোঝা যায়। নিজেকে প্রস্তুত করার সময় মেলে।

ভুলে যাচ্ছেন, মিঃ স্টিফেন্সন, আমরা এখন বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। তার রূপ এমনই ভয়ঙ্কর—জটিল। মানে—

স্ট্যানলির কথা আর শেষ হোল না। কক্ষের এক কোণ থেকে হকিন্সের চিৎকার শোনা গেল। আমরা চাইতেই দেখি কখন এক সময়ে আমাদের কাছে থেকে সে সরে গিয়ে কাচের জারগুলি লক্ষ্য করছিল!

কি ব্যাপার? চমকে উঠলাম আমি।

মিঃ বোস! মিঃ বোস, এ যে আমাদের ডঃ হাডসন।

কি বললে?

স্ট্যানলিও যেন ভয় পেয়ে গেছেন। আমরা সকলেও। গত ২রা জানুয়ারী ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডঃ হাডসন নিরুদ্দিষ্ট হন। কাগজে সে সংবাদ আমরা পড়েছিলাম। সংবাদদাতা অবশ্য বলেছিল, অনিবার্য কারণবশত এই নিরুদ্দেশের তথ্য সরকার প্রকাশ করতে রাজী নয়। তাই বলে তিনি এখানে কি করে এলেন?

মিঃ মিত্রও যেন ভেঙ্গে পড়বে এবার। বলল, তা হলে হাডসনকেও পিয়ার্সন রেহাই দিল না? বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে কি কাজ করে—সম্প্রতি পিয়ার্সন এ নিয়ে একটি গবেষণা যে চালাচ্ছে, সে সংবাদ আমরা নেগির কাছে পেয়েছি। পিয়ার্সনের ধারণা, একদিন সে সক্ষম হবে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে পৃথিবীর ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত বাতাস সেই রশ্মিদ্বারা কলুষিত হবে। সেই কলুষিত আবহাওয়া বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে—পিয়ার্সনের কাছে সেটাই আজ বড় সমস্যা।

তা হলে কি ডঃ হাডসন সেই গবেষণারই একজন বন্দি?

হকিন্স তো রীতিমত বিচলিত। বলল, মশায়রা, নরকে যাক আপনাদের বিজ্ঞান। আপনাদের মধ্যে যাঁরা এই অদ্ভুত বস্তুটির কাছ থেকে বেশী আকাঙ্ক্ষা করে মানুষের জীবনকে এভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছেন—আমাদের উচিত তাঁদের চাবকে সোজা করা।—একটা মানুষের আকাঙ্ক্ষার জন্য হাজারো সাধারণ মানুষ গুণাগার দেবে?—না, এ হতে পারে না। হায়! হায়! কি ভালমানুষই না ছিলেন হাডসন। ভদ্রলোক আমাদের গাঁয়ের লোক।

কিন্তু বিস্ময়ের তখনও কি শেষ হয়েছে?

একটি চাপা কান্নার শব্দ ভেসে এল আমাদের কানে। আমরা

যেখানে কথা বলছিলাম তার সম্মুখে একটি বিরাট যন্ত্রের ওপাশ থেকে কে যেন বলছেন—মিঃ বোস!

ক্ষীণ তাঁর কণ্ঠস্বর—বিকৃত, করুণ।

কে? ক্যা-প-টেন? ডিয়ার ব্রিকহিল!—বিহ্বল হয়ে পড়েছে হকিন্স।

আঙ্কল্ ব্রিকহিল?

এবার নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না আমি। ইদানীং ওঁকে আমি আঙ্কল্ বলেই ডাকতাম।

যন্ত্রটির ওপারে আসতেই দেখলাম একটি খাটের ওপর শুয়ে ব্রিকহিল। কতকটা প্লাস্টিকের তৈরী এক ধরনের কালো আস্তরণে গলা পর্যন্ত ঢাকা। মাথায় লোহার হুড। পাশের যন্ত্রটি থেকে দুটি তার এসে ঐ হুডের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। তাঁকে খাটের ওপর বেঁধে রাখা হয়েছে।

এ কি আপনার অবস্থা, ক্যাপ্টেন? সকলেই সমস্বরে বলে উঠল।

পাগল! এরা আমাকে পাগল করে দেবে, মশায়। ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগলেন ব্রিকহিল। মিঃ লকসলিকেও ওরা তাই-ই করেছে।

বলেন কি? লকসলিও উন্মাদ? চমকে উঠলাম আমি।

তোমাদেরকেও তাই করবে, বোস। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই যেন বললেন ক্যাপ্টেন—ব্রেন-হরমনের উপর গবেষণা করার ব্যাপারে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে পিয়ার্সন। তার ধারণা, এই হরমনকে নিয়ন্ত্রণ করে একদিন নিজের ইচ্ছামত সকলকে দিয়ে যা খুশি তাই সে করাতে পারবে। ওঃ! মানুষকে হত্যা করে মানুষের গবেষণা।

তা হলে কোন আশাই কি আমাদের নেই, স্যার? স্টিফেন্সনের কণ্ঠে জড়তা।

মানুষ যখন নিজের শক্তির কাছে পরাজিত হয়, তখন আসে সেই

একমাত্র পুরানো কথা—জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন ব্রিকহিল—ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র আশা। যদি আমরা বাঁচি তা ঈশ্বরের করুণায়। যদি মরি—উঃ! উঃ! আবার—আবার সেই আলো—! আমি—আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর সমস্ত মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল।

মিঃ মিত্র এতক্ষণ তাঁর সঙ্গের যন্ত্রগুলি নিয়ে কি যেন করছিল। দুএকবার সেই কক্ষের যাবতীয় যন্ত্রও নিরীক্ষণ করছিল। এবার হঠাৎ খুবই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। আমাদের কাছে এসে বলল, ঐ দেখুন। একটি যন্ত্রের কাছে একরকম টানতে টানতেই সে নিয়ে গেল আমাদের। বিরাট একটি কালো বাক্সের মত। তার উপর ধূসর একটি কাচের প্লেট। প্লেটটি মুহুর্মুহু রঙ পালটাচ্ছে। প্রথমে সবুজ, তারপর বেগুনী, কখনও হলুদ, কখনও সমস্ত রঙের মিশ্রণ। একবার চিক্‌চিক্ করে শব্দ হোল। একটি উজ্জ্বল হলুদ স্ফুলিঙ্গ প্লেটের ওপর ছুটোছুটি করতে লাগল।

মিঃ মিত্র বলল, বোঝা যাচ্ছে নেগি সমস্ত বেতারবীক্ষণ যন্ত্রই বিকল করে দিয়েছে। কিন্তু পিয়ার্সন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছে। পারছে না। সম্ভবত সে পারমাণবিক যন্ত্রটি ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। ভীষণ এই বোমা। আমাদের সহজে ধ্বংস করতে না পারলে, ওরই সাহায্য সে নেবে। অবশ্য এই কক্ষে থাকতে পারলে ও বোমা কিছুই করতে পারবে না।

তা হলে উপায়? যা কিছু করার, তাড়াতাড়ি সারতে হবে আমাদের।—স্টিফেন্সন অনেকটা যেন শক্ত হয়ে উঠলেন।

মিঃ মিত্র তার হাতের ছোট্ট ট্রান্সমিটারে স্কুইরেল এবং ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। হ্যালো, হ্যালো—মেরিনার স্কুই। মেরিনার স্কুই! জিরো, জিরো সেভেন নাইন সিক্স।—হ্যালো···

হ্যালো, হ্যালো! মেরিনার স্কুই। মেরিনার স্কুই। সিক্স নাইন সেভন জিরো, জিরো···গ্রান্ট স্পিকিং, গ্রান্ট স্পিকিং···

পরিষ্কার সিগন্যাল এল স্কুইরেল থেকে।

মিঃ স্টিফেন্সনও ডেস্ট্রয়ারের রেডিও অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন—হ্যালো, হ্যালো, পয়েন্ট সিক্স জিরো। মিঃ মর্‌লি, অফিসার এক্স স্পিকিং···

এরপর দুজনেই সংকেতে কি ধরনের বিপদ আসতে পারে এবং কি ভাবে নিজেদের তারা রক্ষা করবে তা তাদের জানিয়ে দিলেন।

আর ঠিক তার পরমুহূর্তে। কোন কিছু চিন্তা করার আগেই দেখি আবার সেই মূর্তিগুলির কখন আবির্ভাব হয়েছে। তারা আমাদের জড়িয়ে ধরল। মাথায় সেই ভৌতিক আলো। সে আলো যেন আমাদের সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়েছে। আমরা ওদের হাতের পুতুল হয়ে গেছি।

ওরা আমাদের নিয়ে এল প্রথম কক্ষে। ওদের নির্দেশে আমরা পাশাপাশি দাঁড়ালাম। ওরা এক একজন আমাদের থেকে ছয় ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়াল। হাতের মুঠোয় টর্চের মত দেখতে একটি করে যন্ত্র। কোন শব্দ নেই—কোন চঞ্চলতা নেই। ওদের নীরব চালচলনও বুঝি সহ্য করার বাইরে। বুঝলাম এবারই হয়ত ঘটবে আমাদের চরম পরিণতি!

রাতিমত নাটকীয় ব্যাপার! একটা মৃদু গুঞ্জন শুধু কানে ভেসে আসছে। নিথর পাথরের মত মূর্তিগুলি আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আর সেই সঙ্গে আমাদের নড়বার ক্ষমতাও যেন কে কেড়ে নিয়েছে।

অবশেষে হাতের টর্চের মত যন্ত্রগুলি একে একে আমাদের দিকে বাগিয়ে ধরল তারা। আর তারপরই সেই কক্ষের এক কোণে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল একটি আলো। মুহূর্তে সেদিকে চাইতেই আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেল।

পিয়ার্সন !!!

ডঃ স্ট্যানলি যেন অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলেন—পি-য়া-র্স-ন !

পরিষ্কার দেখলাম পিয়ার্সনের মুখ। সাদা পোশাকে তাকে খুবই স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। সেই পোশাকের উপর খুব পাতলা অথচ স্বচ্ছ এক রকমের আবরণী। খুবই গম্ভীর মনে হোল তাকে। খুব ব্যস্তবাগীশের মত কি সব করে চলেছে সে।

একটি সুইচ-বোর্ডের উপর হাত রাখল পিয়ার্সন। তার গম্ভীর কণ্ঠে—সে কণ্ঠের প্রতিটি স্পন্দন যেন সমস্ত স্নায়ুকে অবশ করে দেয়—বলতে লাগল, রবট নাম্বার ওয়ান—টু—থ্রি ! আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ মূর্তিগুলির মাথার ওপর যে সবুজ আলো জ্বলছিল তাদের রঙ পালটাতে লাগল। প্রথমে হোল পীতাভ, তারপর গাঢ় নীল, অবশেষে ফিকে বেগুনী। আর তারপরই ওদের টর্চ থেকে তীব্র এক প্রকারের রশ্মি এসে পড়ল আমাদের চোখে। ওঃ! অসহ্য—অসহ্য সেই রশ্মির তেজ ! আমরা না পারি মুখ ফেরাতে, না পারি চোখ বুজতে। মনে হোল আমাদের মাথা বুঝি খারাপ হয়ে যাবে। কি সাংঘাতিক কাণ্ড। কি অদ্ভুত ভাবেই না ওরা কর্তার আদেশ পালন করে চলেছে। মৃত্যু ! অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে কেউ আমাদের আর রক্ষা করতে পারবে না।

কক্ষের মধ্যে আবার পিয়ার্সনের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হোল: ডঃ স্ট্যানলি, মিঃ বোস, বিশ্বাসঘাতক মিত্র এবং সকলে, পৃথিবীর এক কোণে বসে নীরবে আমি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলাম আপনারা

পদে পদে তাতে বাধা সৃষ্টি করেছেন। বেশী কথা বলার অবকাশ আমার নেই। আমি ঘোষণা করছি, মৃত্যুই আপনাদের একমাত্র শাস্তি!

আর তার পর মুহূর্তেই আমাদের সমস্ত দেহ কে যেন অবশ করে দিল। আমরা সকলেই কাঁপতে লাগলাম এবং পরক্ষণেই মূর্ছিতের মত পড়ে গেলাম মেঝের উপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে—প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দে সমস্ত কক্ষ কেঁপে উঠল। মাথা ঘুরতে লাগল আমাদের। স্টিফেন্সন তো ভয়ে সেই যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন, আর মুখ ফোরানর নাম নেই। হকিন্সের ভির্মি খাবার অবস্থা। কোন কিছু ভাবার সামান্যতম ক্ষমতাও আমার লোপ পেয়েছে। আমরা কে, কোথায় যে রয়েছি সেটুকু অনুভব করার ক্ষমতাও নেই।

হকিন্স শুধু এর মধ্যে একবার করুণ এবং অস্ফুট কণ্ঠে বলল, বিদায় মশায়রা, বিদায় মিঃ বোস! তা হলে শেষ পর্যন্ত আমরা মরেই গেলাম।

একথার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না।

আরও কয়েকটি মুহূর্ত কাটল অতি দ্রুত। কতকগুলি পায়ের শব্দে সম্বিত ফিরে পেলাম। কিন্তু এ আবার নতুন কি কাণ্ড? চাইতেই দেখি সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়ান সেই মূর্তিগুলিকে কে যেন এক ঝট্‌কায় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের অবশ ভাবটাও কেটে গেল। আর মিঃ পিয়ার্স'ন তার সুইচ-বোর্ডের উপর এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে।

এই শেষ সুযোগ। নিশ্চয় কোন যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলাম যেন। মিঃ মিত্র চিৎকার করে হুকুম দিল, এগিয়ে চলুন। চালান গুলি। ওকে সরে পড়তে দেবেন না আপনারা।

ঠিক এই সময়েই সবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন তিনজন আগন্তুক। এঁদের মধ্যে নেগিও রয়েছে।

নেগি! আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

ডাক্তার হে! ডঃ এবিংহাউস!! মিঃ মিত্রের কণ্ঠে রীতিমত আবেগ।

আমরা সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম পিয়ার্সনের উপর। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ঘরের সমস্ত আলো নিবিয়ে দিল পিয়ার্সন।

দুম্-দুম্-দুম্! একই সঙ্গে পর পর গুলি চালালো নেগি। কিন্তু কোন কাজই হোল না। একটা প্রচণ্ড হিস্-হিস্ শব্দ ভেসে এল আমাদের কানে।

নেগি চিৎকার করে বলল, বেরিয়ে আসুন। বেরিয়ে আসুন আপনারা বাইরে। বিষাক্ত গ্যাস ছেড়েছে পিয়ার্সন।

ততক্ষণ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে সমস্ত কক্ষ। তারই মধ্যে আমরা ছুটোছুটি করতে লাগলাম।

কিন্তু পিয়ার্সন? কথা বলার চেষ্টা করলাম আমি।

আর পিয়ার্সন! নিজেদের আগে বাঁচান তো?

এই বলে আগে আগে ছুটতে লাগল নেগি। তাকে আমরা সকলেই অনুসরণ করলাম। বুঝলাম, কোনো রন্ধ্রপথে পিয়ার্সন আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে।

নেগি বলল, যেখানে ও দাঁড়িয়েছিল, তার নিচেই ছিল অটোমেটিক লিফ্‌ট। হায় ভগবান! ওটাকে বিকল করার কথা আমার মগজে আসে নি!

ডঃ এবিংহাউস গম্ভীরভাবে হাতের টর্চ নিয়ে পলকের জন্যে একবার চারদিকটা দেখে নিলেন। বললেন, আমাদের নৌকো শেষ পর্যন্ত পাড়ে

এসে একেবারে ভস্ করে ডুবে যাবে, স্বপ্নেও ভাবি নি।—তাঁর কণ্ঠে ব্যর্থতা।

বুঝলাম সকলের সমস্ত চিন্তা বা পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে পিয়ার্সন আমাদের হাতের মুঠোর বাইরে চলে গেল!—

কিন্তু কোথায় যেতে পারে? নেগির নির্দেশমত দূরে অবস্থান রত স্কুইরেল এবং ডেস্ট্রয়ার থেকে বাজ পাখীর চোখ নিয়ে সারা সমুদ্রের ওপর নজর রাখছিল মেজর স্টিফেন্সনের নৌবাহিনী এবং স্কুইরেলের মাল্লারা। কথা ছিল তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখে চলব। কিন্তু নিজেদেরই তখন হিমশিম অবস্থা। কার খবর আর কে রাখে?

নেগি বলল, পিয়ার্সনের কবলে পড়ে যাঁরা এখানে বিভিন্ন ভাবে আটকে রয়েছেন তাঁদের আর রক্ষা করা গেল না, মিঃ বোস।

কেন, তাঁরা কি এখানে নেই? চমকে প্রশ্ন করলাম আমি।

ছিলেন। এখন নেই। ওঁদের কাউকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। এখানে আসার আগে একবার শেষ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাজিটা তাঁদের এমন একটি কক্ষে রেখেছে যেখানে আমাদের কারুর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই গ্যাস বোমা ছাড়া মানে, এতক্ষণ তাঁরা পুড়ে সাফ হয়ে গেছেন। এমার্জেন্সির সময় এই ব্যবস্থাই করেছিল পিয়ার্সন। নেগি ধরা গলায় উত্তর দিল।

আসলে বোঝা গেল, পিয়ার্সনের যাবতীয় পরিকল্পনা এমন সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছে যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা আমাদের পক্ষে কঠিন। অত যে তোড়জোড়, অত যে কায়দা কানুন, এ পর্যন্ত আমরা যা করে এসেছিলাম, যেন তা ব্যর্থ হয়ে গেছে মাত্র একটি মানুষের বুদ্ধির কাছে। শুধু আমরাই এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করলাম। ডেস্ট্রয়ার বা স্কুইরেলের মাল্লাদের সন্ধানী চোখে কিছুই পড়ল না। অন্ধকার সমুদ্রের বুকে যে কি দারুন কাণ্ড ঘটে গেল কিছুই ঠাহর করতে পারল না তারা। অর্থাৎ এ

ব্যাপারে ওরা নীরব দর্শক হয়েই রইল। যেন হাউই-এর মত ফুস করে জ্বলেই নিভে গেল সব।

এর মধ্যে চারদিকে সেই বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় আমাদের দম বন্ধ হবার যোগাড়। অলিগলি-পথ ধরে ছুটতে লাগলাম আমরা। সে পথের যেন শেষ নেই। বেচারা বৃদ্ধ হকিন্স তো এলিয়েই পড়ল প্রায়। ডঃ স্ট্যানলিরও ঐ অবস্থা। হকিন্সকে কতকটা জড়িয়ে নিয়েই এগুতে হোল আমাকে। ভগবানকে ধন্যবাদ। শেষ পর্যন্ত আমরা সাফল্যমণ্ডিত হলাম, অর্থাৎ সেই বিভীষিকাপূর্ণ জায়গা থেকে এলাম আকাশের নিচে।

আর তার পরই শুরু হোল এক প্রাণান্তকরী সংগ্রাম। পারমাণবিক বিজ্ঞান যে কি দারুণ বীভৎস রূপে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে তার বর্ণনা এখানে অবিকল তুলে দিচ্ছি আমার পুরানো ডায়েরীর পাতা থেকে। হয়ত এর মধ্যে সাহিত্যের উপাদান পাওয়া যাবে না। কিন্তু কাটা ছেঁড়া ভাবে সেই দুর্ঘটনার পর যা আমি লিখে গেছি তার মধ্যে ফুটে উঠবে সত্যিকারের পরিস্থিতি—একটি বাস্তব দৃশ্য।

…"বাস্তব জ্ঞান আমাদের কারুরই ছিল না। বাইরে আসতেই দেখি আকাশ একটু পরিষ্কার, অর্থাৎ চারদিকটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। ডঃ হে, ডঃ এবিংহাউস এবং নেগি ছুটতে ছুটতে আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন একটি সিসের তৈরী বদ্ধ ট্রেঞ্চে। নেগি হুকুম দিল, তাড়াতাড়ি আপনারা শুয়ে পড়ুন এর নিচে। পিয়ার্সন পরমাণু-বোমা ছুঁড়েছে ডেল্টা দ্বীপ লক্ষ্য করে। তবে একথা হলপ করে বলতে পারি ও নিজেও পরিত্রাণ পায় নি। কারণ এখানে পাথরের নিচে যে জেনারেটার কক্ষটি রয়েছে সেটির ধ্বংস হলেই তবে এখান থেকে সিংগন্যালিং যাবে ৪নং দ্বীপে। আর তখন সেখান থেকে সেই বোমা

আপনা আপনিই উৎক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়বে এখানে। আর সে কক্ষ ধ্বংস করতে হলে পিয়ার্সনকে নিজে যেতে হবে সেখানে। অতএব সে বেঁচে থাকতে পারে না…!"

"কোন কথা না বলে সকলেই আমরা ট্রেঞ্চের মধ্যে শুয়ে পড়লাম। সিসের আবরণী ভেদ করে পারমাণবিক প্রভাব আমাদের কিছু করতে পারবে না—নেগি বলল। বাইরে ততক্ষণ শুরু হয়েছে বিস্ফোরণের দুম্-দাম্ শব্দ। কানে যেন তালা লেগে যাবে। প্রচণ্ড ঝড় বইছে। কি যেন পুড়ছে। তার ভ্যাপসা গন্ধ নাকে আসতে লাগল।"

"অভুক্ত, দুর্বল এবং দুশ্চিন্তায় মরার মত ঐ ট্রেঞ্চে কাটল আমাদের পুরো তিন দিন। এরই মধ্যে একটা ছোট দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। স্টিফেন্সন বাইরে কি হচ্ছে দেখার জন্যে একবার ট্রেঞ্চের বাইরে মাথা উঁচিয়েছিলেন। নেগি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টি ধরে ট্রেঞ্চের মধ্যে তাঁকে নামিয়ে না নিলে তিনিও মরতেন, আমরাও অক্ষত রইতাম না। কিন্তু এ কি? পঁয়ত্রিশ বছরের সবল এবং সুন্দর স্টিফেন্সনের মুখ মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেছে। মুখের চামড়া গেছে কুঁচকে। মাথার চুল হয়েছে সাদা। বেচারা তো ফুঁপিয়েই কেঁদে উঠলেন।"

"নেগি বলল, থামুন মশায়। বাইরে সারাটা জায়গা এখন দূষিত বিকিরণে ছেয়ে রয়েছে। ঠিক এই সময়েই মুণ্ডুটা গর্তের বাইরে না বের করলে কি চলত না? প্রাণে বেঁচে গেছেন, সেই ঢের। এখন একটু চুপচাপ বসুন তো!"

"তিন দিন পর ডঃ হে একটি স্টিলের স্টিকের এক অংশ তুলে দিলেন ট্রেঞ্চের একটি গর্ত দিয়ে বাইরে। এক মিনিট পর আবার তাকে নিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগলেন তিনি। দেখলাম, স্টিকের ডগায় ছোট্ট একটি কাঁচের প্লেট। তার উপর ছক্ আঁকা। তার মাঝখানে কালো একটি রেখা। ডঃ এবিংহাউস, নেগি এবং ডঃ হে ঐ

রেখা পরীক্ষা করে বললেন, আর বারো ঘণ্টার মধ্যে বাইরের বাতাসে পারমাণবিক ভস্মের পরিমাণ কমে যাবে, অর্থাৎ আমরা তখন বাইরে বের হতে পারব।”

“হকিন্স এবং গ্রের অবস্থা তো শোচনীয়। আরও বারো ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে হবে জেনে তারা বুঝি মূর্ছিত হয়ে পড়বে।”

“দীর্ঘ বারো ঘণ্টা যেন কাটল বারো যুগ পর। একে একে আমরা ট্রেঞ্চের বাইরে বের হয়ে এলাম। দেখলাম, বাইরের সমস্ত গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সমুদ্রের জলে প্রবল উচ্ছ্বাস। আমাদের মোটর বোটটির ছাতটি গেছে উড়ে। কোন রকমে জলের উপর ভাসছে।

“নেগির সাহায্যে ক্যাপ্টেন ব্রিকহিলকে অক্ষত অবস্থায় আমরা উদ্ধার করলাম। বেচারা ব্রিকহিল! তখন তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদপ্রায়।”

“সেই দিনই আমরা সোজা চলে এলাম ৪নং দ্বীপে। স্কুইরেল-এর এবং আমেরিকান ডেস্ট্রয়ারের লোকেরা যে ধৈর্য এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নেই। ব্যাপার দেখে ওরা আগে থেকেই বহুদূরে সরে যায় এবং চার দিন পর ৪নং দ্বীপ থেকে আমাদের সিগন্যাল পেয়ে আবার ফিরে আসে।”

“ডঃ হে, ডঃ এবিংহাউস এবং নেগি একটি সাবমেরিনে করে ডেল্টা দ্বীপে এসেছিলেন। সেটি একটি ফাঁড়ির মধ্যে থাকায় রক্ষা পেয়েছে।”

“৪নং দ্বীপে এসে যা সকলের দৃষ্টি সবচাইতে বেশী আকর্ষণ করল তা হোল, দ্বীপের উপর দিয়ে যেন একটা বিরাট ধ্বংসকাণ্ড ঘটে গেছে। এখানকার সমস্ত গাছপালা গেছে শুকিয়ে। স্থানে স্থানে গভীর খাত সৃষ্টি হয়েছে। আর মাটি গেছে পুড়ে। দ্বীপে নেমেই একটি জীর্ণ পাতা সংগ্রহ করে ডঃ হে আমাদের দেখালেন। বললেন, এই সেই

মৃত্যু-বীজ! মিঃ মিত্র, এই পাতার রস মাখান পিন আপনাকে একদিন আপাত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।"

"শিউরে উঠে সেই প্রাণঘাতী পাতা দেখতে লাগলাম আমরা।"

"লরাকে এবং মিঃ লকসলিকে আমরা উদ্ধার করলাম। নেগি ওঁদের মাটির নিচের একটি বিশেষ কক্ষে লুকিয়ে রেখে যায়। তাই এত সব কাণ্ডেও ওদের কোন দৈহিক ক্ষতি হয় নি। কিন্তু বেচারা লকসলি। তিনি তখন সম্পূর্ণ উন্মাদ!! সুসংবাদ শুধু এই পিয়ার্সনের সমস্ত অনুচর—এমন কি সেই রবটরা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।"

এমনি করে শেষ হোল সাগর-সংঘাত। এমনি করেই ধ্বংস পেল বিরাট এক বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টা। স্কুইরেলে ঘরে ফেরার পথে এই কথাই ভাবছিলাম আমরা।

নেগি বলল, প্রচেষ্টা নয়, মশায়, বলুন অপচেষ্টা। এমন বিজ্ঞান জাহান্নামে যাক।

কিন্তু পিয়ার্সনের পরিচয় আজও যেন কেমন ধাঁধাঁ মনে হচ্ছে, মিঃ নেগি। না বলে পারলাম না আমি।

মিঃ নেগি বলতে লাগল, ব্যাপারটা তেমন কোন মহান ইতিহাস নয় মিঃ বোস। সংক্ষেপে বলা চলে, পিয়ার্সন একজন শয়তান। দেশ থেকে একদিন নির্বাসিত হয়ে প্রথমে সে হয় জলদস্যু। তার পর আসে ৪নং দ্বীপে। দেখতেই পেয়েছেন আপনারা, এ দ্বীপ অতি প্রাচীন। ব্রেজিলকে কেন্দ্র করে একটি উন্নত ধরনের সুপ্রাচীন সভ্যতা প্রশান্ত মহাসাগরের বহু নাম না জানা দ্বীপে একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল। মায়া এবং ইনকা সভ্যতার কথা হয়ত আপনারা জানেন। এদের সঙ্গে তারও হয়ত যোগ ছিল। অনেকে বলেন মধ্য-প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার প্রভাবও এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পিয়ার্সন এখানে এসে বহু প্রাচীন

ধনসম্পদ পায়। আর তারপরই ক্ষেপে ওঠে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। আসলে পিয়ার্সন নিজেও ফিলাডেল্‌ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিল। পদার্থবিদ্যায় যে যোগ্যতা একদিন সে ছাত্রাবস্থায় দেখিয়েছিল তার এবং তার ওপর মৌলিক গবেষণার বিভিন্ন সূত্র সত্যিই বিস্ময়কর। এখানে এসে পৃথিবীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিককে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সে নিজের দলে টেনে নেয়। ডঃ কাসাবু, আমার সম্মানীয় শিক্ষক—তিনিও এই দলে যোগ দেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন জ্ঞান-পিপাসু। প্রচুর অর্থ এবং সুযোগ পেয়ে কাজ করে গেছেন, কিন্তু কি যে তার পরিণতি হতে পারে সে কথা ভেবে দেখেন নি।

মিঃ নেগি বলে যেতে লাগল, স্কুইরেলকে পিয়ার্সন সহ্য করতে পারে নি। কারণ স্কুইরেল-এর নাবিক মিঃ মিত্র এই দ্বীপের একটি ম্যাপ তৈরী করে ফেলেছিল, এ সংবাদ সে জানত। মিঃ মিত্র এদের গবেষণাগারগুলির একটি সাংকেতিক ম্যাপও সংগ্রহ করেন। আর সেই কারণেই তাঁকে হত্যা করা হয় (বলুন আপাত হত্যা)। লরাকে অপহরণ করা হয় শুধু ভৌতিক ভীতি উৎপাদনের জন্যে।···কি ভাবে আমি আপনাদের সাহায্য করেছি সে কথা বলতে গেলে একটি বিরাট মহাভারত লিখতে হয়। তবে প্রতি পদে পদে ওকে আমি বাধা দিয়েছি, আপনাদের সাবধান করেছি। আর ওর কলাকৌশলও আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন।

তবু বলব, গুহার মধ্যে হঠাৎ ঐ রবটগুলির সম্মুখে পড়ে প্রাণের আশা আমরা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম, মিঃ নেগি। আমি না বলে পারলাম না।

তার জন্য দায়ী আপনারা। ডেল্টা দ্বীপে ওঠার সময় নিশ্চয় আপনারা কেউ ঐ আলোটিতে ধাক্কা মেরেছিলেন—অর্থাৎ আমি ঐ লাল আলোর কথা বলছি। ঐ আলোই তো সিগন্যাল দেয় পিয়ার্সনকে।

নইলে সে বুঝতেই পারত না কি ভাবে কি হচ্ছে। আসলে কোন নাটকীয় ঘটনা সৃষ্টি করার জন্যে কোন সুযোগ পিয়ার্সনকে আমি দিই নি। আ[ি] জানতাম রবটদের মাথার ঐ সবুজ আলো—ঐ তেজস্ক্রিয় জেড-রশ্মি আপনাদেরকেও পাগল করে দিতে পারে।

হকিন্স স্টিফেন্সনকে লক্ষ্য করে বলল, স্যার, এবার আপনি আমাদে[র] কর্তা হলেন। অনুগ্রহ করে আমাদের খাবার দায়িত্বটি আপনি নিন। পেটের মধ্যে আমাদের নেকড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

স্টিফেন্সন নীরবে নেগির কথা শুনছিলেন। আসলে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় তাঁর চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় তিনি এত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন যে, আমাদের কোন আলোচনাই যেন তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নি।

হকিন্সের কথায় বিরক্ত হলেন তিনি। বললেন, সে উপদেশ আর তোমায় দিতে হবে না। সরকারী দায়িত্ব আমার, সে আমি জানি। হেডকোয়ার্টার্সকে বলেছি, কেপ হর্ণে সাহায্য পাঠাতে। দু-এক দিনের মধ্যেই প্লেনে আমরা রসদ পাব।

সমস্ত গুছিয়ে ফেরার ব্যাপারে প্রস্তুত হতে সময় লাগল আরও দু দিন। ক্যাপ্টেন ব্রিকহিল নীরবে শুয়ে রয়েছেন স্কুইরেল-এর ক্যাবিনে। পাশে লরা। তারও কণ্ঠ নীরব। আমরাই বা কি সান্ত্বনা দেব। কিন্তু দুঃখ শুধু মিঃ লকসলির জন্যে। অমন শক্ত সমর্থ লোক যে অমনভাবে উন্মাদ হয়ে যাবে তা কে জানত?

আমরা বাড়ীর দিকে যাত্রা করলাম ৩০ শে জুন।

ডঃ এবিংহাউস এবং নেগি সেদিন আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, মিঃ বোস, ক্ষতি আমাদের অনেক হয়েছে। তবু আশার কথা এই, মাত্র দশদিনের মধ্যে সকলের অজ্ঞাতে পৃথিবীর উপর যে প্রচণ্ড তাণ্ডব

বয়ে যেত, সেকথা তোমরা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। অন্তত পৃথিবীর দশটি স্থানে যে প্রচণ্ড পারমাণবিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনা ছিল, আপাতত তা থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেলাম।

আপাতত? ডঃ এবিংহাউসের হেঁয়ালী যেন বোঝা ভার।

'আপাতত' এই কারণে বলছি, পিয়ার্সনের মৃতদেহ আমরা দেখে আসতে পারলাম না।

তা হলে কি মনে করেন, মিঃ পিয়ার্সন—

পারমাণবিক জেনারেটারের ঘরে তার মৃত্যু হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন যেন আমার মনে হচ্ছে যেখানে দাঁড়িয়ে ও কথা বলছিল, সেখান থেকেও ঐ যন্ত্রটি ধ্বংস করা যেত। আর তা যদি হয়,—পিয়ার্সনকে কিন্তু আমরা নাগালের বাইরে ছেড়ে দিয়ে এলাম! বলল নেগি।

কিন্তু নেগিরও ভাগ্যে বুঝি আর একটি চমকের বাঁকি ছিল। মানে যাকে বলে মোক্ষম ঘা।

স্কুইরেলের একজন মাল্লা জিম হঠাৎ ভূতের মত এসে হাজির হল সকলকে দারুণ ভাবে চমকে দিতে।

কি ব্যাপার, জিম, অত হাঁপাচ্ছ কেন? মিঃ মিত্র প্রশ্ন করলেন।

কি বলব, স্যার। জাহাজের প্রপেলারটার পাশে জলের একটু নীচে এই মাত্র একটি বাক্সের মত কি যেন ভাসছিল। আমরা তুলে নিতেই, তার মধ্যে দেখি একটি মানুষ—মরে পড়ে রয়েছে, স্যার। মুখটা তার একেবারে সাদা ফ্যাকাসে মেরে রয়েছে—কাগজের মত সাদা—

থামো দেখি! মাল্লারা একবার বক বক শুরু করলে কি আর সহজে থামে। যেন খেঁকিয়ে উঠল মিঃ মিত্র।— কোথায় সেটা?

জিম যেন ঘাবড়ে গেছে মিঃ মিত্রের চিৎকারে।

আমার সঙ্গে আসুন আপনারা, স্যার। বলেই ছুট দিল জিম।

আমরা ওর পিছু নিলাম।

কিন্তু বাক্সের কাছে গিয়েই চিৎকার করে উঠল নেগি। কি সর্বনাশ। এবার আমি নির্ঘাত পাগলা হয়ে যাব।—পিয়ার্সন—! কি—ব্যা—পার! নেগির কণ্ঠে বিস্ময়।

হ্যাঁ, তাই তো। মাল্লারা জল থেকে যে বাক্সটা তুলেছে তার মধ্যে পিয়ার্সনই তো পড়ে রয়েছে।

ডঃ স্ট্যানলি সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে পরীক্ষা করল পিয়ার্সনকে।—এঃ! মরে গেছে। শুধু এটুকুই তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? স্টিফেন্সনের প্রশ্ন।

নেগি কিছুক্ষণ চুপ। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে বাক্সটার দিকে চেয়ে রইল। যেন খুঁটিয়ে দেখল সব কিছু। তারপর স্টিফেন্সনের দিকে চেয়ে বলল, মরণ কামড় দিতে এসেছিল মশায়, যাকে বলে মোক্ষম কামড়। নেগি বাক্সটা পরীক্ষা করতে করতে বলল।

হ্যাঁ, বাক্সই বটে। তবে বাইরে থেকে দেখতে কতকটা হাঙ্গরের মত। ঐ রকমই চেহারা, রঙও। প্রায় ফুট সাতেক লম্বা। তার ভেতরে নানা রকম যন্ত্রপাতি। মাঝখানে মাথায় একটি হেডফোনের মত কি লাগিয়ে যেন শুয়ে রয়েছে পিয়ার্সন। সাদা পোশাকে ওর ফ্যাকাসে মুখটাকে যেন মমীর মত আবেগবিহীন মনে হচ্ছিল। শান্ত, ক্লান্ত এবং অসহায় সে চেহারা দেখে কে বলবে এরই জন্যে আমাদের এত ধকল সহ্য করতে হয়েছে।

সকলেই আমরা হতভম্ব। নির্বাক। শুধু ভীড় করে চেয়ে রইলাম পিয়ার্সনের মুখের দিকে।

নেগি অনেকক্ষণ কথা বলল না। শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল

বাক্সটির সমস্ত যন্ত্রপাতি আবার। একসময়ে ছোট্ট বলের মত একটি কালো রঙের কি যেন তুলে আনল বাক্সটির ডগা থেকে।

টাইম বোমা। ধীরে কথা বলল নেগি।—এখনও চালু করা হয় নি। বুঝতেই পারছেন আপনারা আসল ব্যাপারটা কি? পিয়ার্সন তাহলে আমাদের চোখের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এক সময়ে স্কুইরেলেকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। আমাদের খতম করার মতলব আর কি। কিন্তু সে জানত না, তার আগেই তাকে আমরা খতম করে দিয়ে আসি ডেল্টা দ্বীপে। এই বাক্সটি ডুবো জাহাজ ছাড়া কিছুই না। সে যাতে এটিকে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্যে ডেল্টা দ্বীপ থেকেই এটিকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়। আমরা, মানে লরা তাই-ই করেছিল। এর ভেতরেও ছিল বিষাক্ত গ্যাসের চেম্বার। পিয়ার্সন জানত না একে ধ্বংস করা হবে। তাই এতে চড়ে মনের সুখে সে অনুসরণ করছিল আমাদের সাবাড় করতে। কায়দাও করে ফেলেছিল প্রায়, জাহাজের পাশে পাশে হাঙ্গরের মত এটিকে ভাসিয়ে আমাদের ধোঁকা দিতেও ছাড়ে নি। ৪ নম্বর দ্বীপের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি চালু করে রেখে এসেছিলাম আমি। পিয়ার্সন সেটা ধরতে পারে নি। তারপর সেই যন্ত্রই বেতার তরঙ্গের সাহায্যে বিষাক্ত গ্যাসের ক্যাপসুলটি খুলে দিয়েছে যখন পিয়ার্সন মনের সুখে এতে চেপে বসে স্কুইরেলের হালের পাশে পাশে আমাদের অনুসরণ করছিল। ব্যাচারা পিয়ার্সন। তখন তার কিছুই করার মত ক্ষমতা ছিল না।

নিয়তি! বললাম আমি।

নেগি বুকের ওপর ক্রস আঁকল। বলল, লোকটার গুণ ছিল অনেক। কাজে লাগাতে পারল না। তারপর জিমের দিকে চেয়ে বলল, সাবাস! জিম। একটা মস্ত দুশ্চিন্তা থেকে তুমি আমাদের রেহাই দিলে।

সমস্ত কিছুই যেন নাটকীয় ব্যাপার। মন্তব্য করলেন ডঃ স্ট্যানলি।

পিয়ার্সনের মরদেহ সাগরেই সমাধি দিলাম আমরা। সেই সঙ্গে টাইম বোমাটিকেও। শুধু হাঙ্গর-বাক্সটি রেখে দেওয়া হল পরীক্ষা করার জন্যে।

নেগি যেন একেবারে চুপ হয়ে গেল এরপর। সকলেই। প্রতিটি মুহূর্তের অদ্ভুত উত্তেজনা আমাদের সকলকেই বেশ নাড়া দিয়ে গেছে। বিশেষ করে পিয়ার্সনের নাটকীয় সমাপ্তি তো বটেই। নিজেদের মধ্যে কথা বলার ক্ষমতা তখন আমাদের নেই।

নেগি একসময়ে শুধু মন্তব্য করল, লোকটাকে কাজে লাগান গেল না।

তারপর চুপ।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তখন নেমে এসেছে সন্ধ্যা। আকাশের পর্দায় ফুটে উঠছে এক একটি নক্ষত্র। স্কুইরেল-এর ডেকের ওপর বসে সেদিকেই শুধু চেয়ে রইলাম। জয়-পরাজয়ের চিন্তা এখন থাক। কেপ হর্ণে পৌঁছে ব্রিকহিল, লকসলি এবং স্টিফেন্সনের চিকিৎসার ব্যাপারটাই প্রথম ভাবতে হবে আমাদের। ডঃ হে মনে করেন, হয়ত তাঁরা সেরে উঠবেন। তাই কেপ হর্ন-এ পৌঁছনোর পর আর বিলম্ব না করে প্লেনে তিনি ক্যালিফোর্ণিয়া যাত্রা করবেন এঁদের সঙ্গে নিয়ে। এটাই তখনকার মত স্থির করা গেল।